সম্ভাষা

(বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজ-এর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পত্রিকা)

-ঃ সম্পাদনা ঃ-

পত্রিকা উপ-সমিতি

পুনর্মিলন উৎসব ঃ ২০২৩

বাংলা বিভাগ

মানকর কলেজ

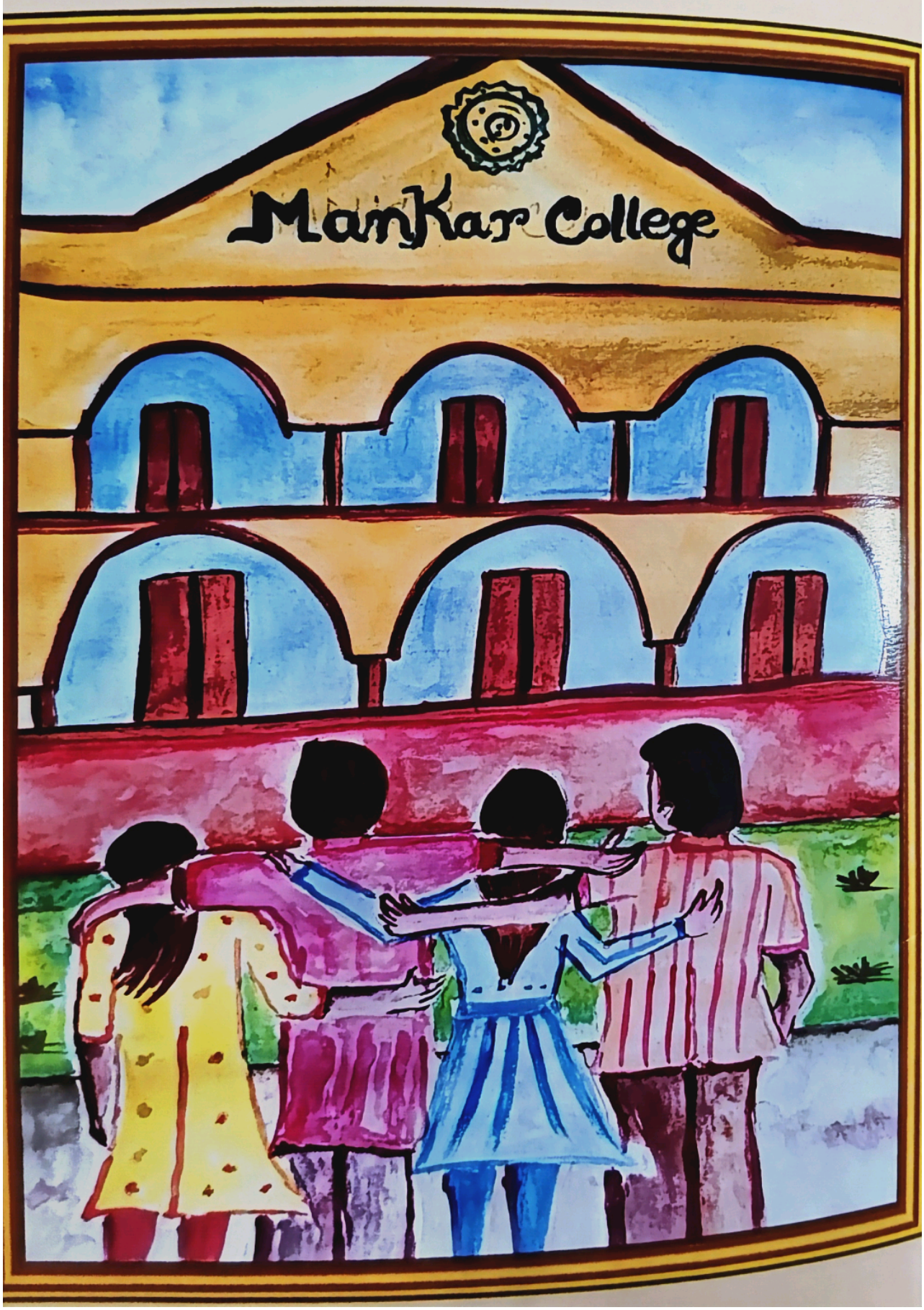
Mankar College

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় – (১)
- অধ্যক্ষ মহাশয়ের কলমে – (২)
- বিভাগীয় প্রধানের বার্তা – (৩)
- আঞ্জুমান লিপি- স্মৃতির পাতায় মানকর কলেজ – (৪-৬)
- নির্মাণ পাল- আমার প্রাণের মানকর কলেজ – (৭-৯)
- অরিন্দম অধিকারী – আয় পাখি, ঘরে আয় – (১০)
- প্রবীর কুমার পাল – এখনও – (১১)
- অমানিশা- সুখের মোড়ক – (১২)
- সেখ মেহের আবদুল্লাহ – সম্পর্ক বদলে যায়! – (১৩)
- বনশ্রী দত্ত – শুভেচ্ছা বার্তা – (১৪)
- প্রতিম দত্ত – শুভেচ্ছা বার্তা – (১৫)
- শিখা হালদার – অনন্তরাত্রি – (১৬)
- সোমনাথ ধারা – বর্তমান বাঙালি মননে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি – (১৭-১৯)
- সন্দীপ ঘোষ – মানকর কলেজ – (২০-২২)
- অনুপম সরকার – স্বৈরিনী – (২৩-২৭)
- মানসী কুন্ডু – আমার প্রিয় কলেজ – (২৮-২৯)
- শ্বেতা দে – পুরানো সেই দিনের কথা – (৩০)
- ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য্য – বসন্ত শেষে – (৩১)
- সুরজিৎ গোস্বামী – কাঁচের স্বপ্ন – (৩২)
- চঞ্চল ভট্টাচার্য্য – অন্তহীন – (৩৩)
- মৌসুমী বেজ – মানকর কলেজ – (৩৪)
- শিবরাম হাঁসদা – প্রিয় মানকর কলেজ – (৩৫)
- শেষাদ্রী চ্যাটার্জী – যুদ্ধ অভিসার – (৩৬)
- অমিত লোহার – ক্ষণিকের স্মৃতি – (৩৭)
- অরিন্দম পাল – শেষ গন্তব্যে – (৩৮)
- সুস্মিতা দাস – আহ্বান – (৩৯)
- প্রথমা ঘোষ – অভিমান – (৪০)
- পূজা ধীবর – পণপ্রথা – (৪১)
- তিথি চ্যাটার্জী – দুর্গা – (৪২)
- মানসী কুন্ডু – পুলক – (৪৩)
- কল্যাণ কর্মকার – ছবি
- শ্বেতা দে – ছবি

পুনর্মিলন উৎসব - ২০২৩ আয়োজন সমিতি

বাংলা বিভাগ

মানকর কলেজ

মানকর, পূর্ব বর্ধমান

****

সভাপতি – অধ্যাপক ড. সুকান্ত ভট্টাচার্য্য (অধ্যক্ষ, মানকর কলেজ)

সহ-সভাপতি – ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজ)
ড. অরিন্দম অধিকারী (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজ)
ড. প্রবীর কুমার পাল (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজ)

উপদেষ্টা মণ্ডলী – অধ্যাপক কাজল রায়, অধ্যাপক সেখ মেহের আবদুল্লাহ, অধ্যাপিকা বনশ্রী দত্ত,
অধ্যাপক প্রতিম দত্ত (বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজ)

সম্পাদক – সন্দীপ ঘোষ

যুগ্ম-সম্পাদক – চঞ্চল ভট্টাচার্য ও কস্তুরী চৌধুরী

কোষাধ্যক্ষ – অরিন্দম পাল

- **প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্নভোজ আয়োজক উপ-সমিতি**

সমন্বয়সাধক – ড. প্রবীর কুমার পাল

আহ্বায়ক – দীপক ভট্টাচার্য

সদস্যমণ্ডলী – শিবরাম হাঁসদা, অনিকেত বাগদী, দীপ গড়াই, জয়দীপ মন্ডল, সুরজিৎ গোস্বামী, উৎসব জোদ্দার

- **সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজক উপ-সমিতি**

সমন্বয়সাধক – অধ্যাপক কাজল রায় ও অধ্যাপিকা বনশ্রী দত্ত

আহ্বায়ক – মানসী কুন্ডু

সদস্যমণ্ডলী – পৌলমী মুখার্জি, অর্পণ ঘোষ, সৌমি চক্রবর্তী, শ্বেতা দে, রূম্পা সাহা, ঝুম্পা সাহা

- **পত্রিকা উপ-সমিতি**

সমন্বয়সাধক – ড. অরিন্দম অধিকারী ও অধ্যাপক প্রতিম দত্ত

আহ্বায়ক – ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য্য

সদস্যমণ্ডলী – কল্যাণ কর্মকার, অনুপম সরকার, সোমনাথ ধারা, শেষাদ্রী চ্যাটার্জী, করিমা খাতুন, সুমনা দে

- **জন-সংযোগ উপ-সমিতি**

সমন্বয়সাধক – ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক সেখ মেহের আবদুল্লাহ

আহ্বায়ক – অমন কুমার সরকার

সদস্যমণ্ডলী – সুমনা দাস, প্রিয়াঙ্কা কুন্ডু, রণিতা বোস, অম্বিকা ঘোষ, মহিমা খাঁ

- **সহযোগিতায় – বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজের সকল প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ**

সম্পাদকের কলমে

"আর একটি বার আয় রে সখা
প্রাণের মাঝে আয়। "

মানকর কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল আজ ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ । মানকর কলেজের বাংলা বিভাগ এই প্রথম আমাদের প্রাক্তনীদের আবার কলেজ ক্যাম্পাসে একে অপরের সাথে মিলিত হবার, স্মৃতিচারণ করার সুযোগ করে দিল। আর সেই পুনর্মিলন অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে "সম্ভাষা" পত্রিকার জন্ম। 'সম্ভাষা' যার অর্থ 'সম্বোধন করে কথা বলা বা আলাপ করা'। অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়ে এই অর্থপূর্ণ নামকরণ করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই বিভাগীয় প্রধান ড: অরিজিৎ ভট্টাচার্য মহাশয়কে।

হাজারো সুখ দুঃখের মাঝে আজকের দিনটা আমাদের কাছে খুব প্রিয় কারণ আজ একদিকে আমাদের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন আর একদিকে সম্ভাষার জন্ম। আসলে এই 'সম্ভাষা' তো শুধু পত্রিকা নয়, 'সম্ভাষা' আমাদের সকল কে নিয়ে গড়ে ওঠা এক পরিবার।

আমাদের এই স্মরণিকা সেজে উঠেছে কলেজের অধ্যক্ষ ড: সুকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়, বিভাগীয় প্রধান ড: অরিজিৎ ভট্টাচার্য, বিভাগীয় অধ্যাপক- অধ্যাপিকা ড: অরিন্দম অধিকারী, ড: প্রবীর কুমার পাল, কাজল রায়, বনশ্রী দত্ত, শেখ মেহের আবদুল্লাহ, প্রতিম দত্ত, শিখা হালদার ও প্রাক্তন অধ্যাপক - অধ্যাপিকা এবং আমাদের প্রাক্তনীদের ছোঁয়ায় ।

হ্যাঁ আমরা প্রাক্তনীরা সবাই খুব ভালো না লিখতে পারলেও, একটু আধটু লেখার অভ্যাস হয়তো আমাদের আছে। কলেজের প্রতি ভালোবাসা, অনুভূতি, আর সেই নতুন হাতের কচি কাচা লেখা নিয়েই আমাদের পত্রিকা।

আমাদের এই প্রয়াসকে সার্থক করার প্রচেষ্টায় সামিল আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের প্রিয় বিভাগীয় স্যার - ম্যামেরা এবং আমাদের ভালোবাসার বাংলা বিভাগ ।

এই সুযোগ করে দেবার জন্য কলেজের প্রতি, বাংলা বিভাগের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। আর এই ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। যত জন প্রাক্তনী আজকের এই অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত, যাদের লেখায় সম্ভাষার পাতা ভরে উঠেছে তাদের সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা ।

আমরা যদি পরস্পরের সঙ্গে এইভাবে একাত্মবোধ হয়ে চলতে পারি, তবে আমার বিশ্বাস আগামী বছরগুলোতেও এমনই আর এক পুনর্মিলন উৎসবে আবার আমরা মিলিত হতে পারব।

আমি বড্ড আশাবাদী। তাই আশা করব এবছর যতজন প্রাক্তনীদের নিয়ে পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের সূচনা হল পরের বছর এর থেকে আরও অনেক বেশি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী আমাদের হাতে হাত রাখবে। 'সম্ভাষা' আরো বেশি সাজসজ্জায় সেজে উঠবে।

এই স্মরণিকা প্রণয়নে বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সাথে প্রাক্তনীদের কার্যকারী কমিটি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাবে নিশ্চিত। তার জন্য আগাম ক্ষমাপ্রার্থী। সামনের বছরগুলো তে আরও ভালো করে আরও সাজিয়ে পত্রিকা প্রকাশের অঙ্গীকার রইল ।

আজকের এই বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব এবং 'সম্ভাষা' পত্রিকার জন্ম সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠুক ।
সবাই সুস্থ থাকুন , ভালো কাজের সাথে যুক্ত থাকুন।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের কলমে

মানকর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পুনর্মিলন উৎসব আয়োজন করা হয়েছে এবছরের ৩০ শে এপ্রিল, আমি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং সেই সঙ্গে আমি আনন্দিত যে এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তারা একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে চলেছে। কলেজের পক্ষ থেকে আমি আয়োজক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দকে শুভেচ্ছা জানাই। এই উদ্যোগ গ্রহণের ফলে নিঃসন্দেহে কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বর্তমান বিভাগের অধ্যাপকদের পুনর্মিলন হয়ে যাবে। এই আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে মানকর কলেজ ভবিষ্যতের জন্য নতুন করে বিকাশের রূপরেখা তৈরি করতে পারবে। আমরা চাইবো প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা কলেজের বিকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসুক এবং চলার পথে তাদের তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ দিক যাতে আমরা নতুন ভাবনা ভাবতে পারি। আমরা চাই ছাত্রছাত্রীরা বেশি পরিমাণে পাঠ্য বই পড়ুক জ্ঞান অর্জন করার জন্য এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বই পড়ুক যাতে তাদের ভেতরে পেশাদারী যে জ্ঞান দরকার তার বিকাশ হয়। আমরা চাইবো মানকর কলেজে যে সমস্ত সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম এবং অ্যাড-অন কোর্স হবে সেগুলিতে তারা অংশ নেবে। এইভাবে তারা পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে দক্ষতাও রপ্ত করতে পারবে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলার সংস্কৃতিকে জনমানসে তুলে ধরবে। তারা যে যেখানে এবং যেমনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সেখানে যেন তারা আমাদের সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করে। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজি, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখ মনীষীদের আদর্শকে জনমানসে তুলে ধরবে। চারদিকে যখন দেখি অপসংস্কৃতির হইচই হচ্ছে তখন মানকর কলেজের বাংলা বিভাগ রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস অর্থাৎ বাইশে শ্রাবণ পালন করেছে একটি সুন্দর নাটক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। আবার বাংলার যে এক অনন্য সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে বাউল গানের ভিতর দিয়ে সেদিকে মাথায় রেখে কলেজ কর্তৃপক্ষ বাউল সম্রাট পূর্ণদাসকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে যেখানে ৯০ বছর বয়সে পদ্মশ্রী পূর্ণদাস বাউল মানকর কলেজে গান পরিবেশন করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। চলার পথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলা বিভাগ কলেজের সর্বাঙ্গীন বিকাশে এগিয়ে এসেছে ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্যের সুযোগ্য নেতৃত্বে। আমরা চাই প্রতি বছর এই পুনর্মিলন উৎসব হোক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা স্মরণিকার মধ্য দিয়ে তাদের সৃষ্টিশীল লেখা প্রকাশ করুন।

সকলকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক ড. সুকান্ত ভট্টাচার্য্য
অধ্যক্ষ
মানকর কলেজ

বিভাগীয় প্রধানের বার্তা

বৈচিত্র্যময় মানকর কলেজের জীবনধারা এগিয়ে চলেছে দিন-মাস-বছরের কালচক্রের মধ্যে দিয়ে। শীঘ্রই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ণায়ক সংস্থা 'ন্যাক' আসবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মানকর কলেজের সম্মাননীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সুকান্ত ভট্টাচার্য্য-র সুযোগ্য নেতৃত্বে, কলেজের পরিচালন সমিতির সম্মাননীয় সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতায়, কলেজের সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের নিরন্তর পরিশ্রমে, সর্বোপরি স্নেহের ছাত্রছাত্রীদের সততার উপরে ভিত্তি করে আমরা এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারবো বলেই বিশ্বাস। শিক্ষা জগতে পরিবর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের প্রিয় কলেজেও নানা রূপান্তর আসছে ও আসবে। কিন্তু এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল আদর্শ ও ব্রত যাতে অপরিবর্তিত থাকে, তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরী; বিশেষত মানবজীবনে ব্যক্তিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের যে আশু প্রয়োজন আজ নানাভাবে অনুভূত হচ্ছে, মানকর কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তার বিকাশ সর্বোত্তম হবে এটাই তো স্বাভাবিক। বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজের প্রাক্তনীরা যেন কেবল জীবনের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাতেই থেমে না যায় কারণ,

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা ;"

বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজ তাই তাকিয়ে ছাত্রসমাজের দিকে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের স্বপ্নের 'শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী, বিশ্বাসী ও সাহসী' শত শত যুবক-যুবতী জন্ম নেবে তাদের মধ্যে থেকেই। মানকর কলেজের জীবনযাত্রায় সত্যিকারের জয়শ্রী লাভ তখনই সম্ভব।

বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজের প্রথম পুনর্মিলন আয়োজন সমিতির উদ্যোগে যে পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এই পত্রিকা হয়ে উঠুক একটি তথ্যসমৃদ্ধ পত্রিকা, যাতে করে মানকর কলেজের বৃহত্তর পরিবারের বিভিন্ন সদস্য পরিবার থেকে দূরে অবস্থান করলেও এই পরিবারের হাল-হকিকত সম্বন্ধে অবহিত থাকতে পারেন। আর্থ-সামাজিক কারণে মানুষের পরিবার-জীবন, সমাজ-জীবন আজ বড়ই সংকটাকীর্ণ; কঠিন প্রতিযোগিতার যুগে ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ খুব দ্রুত ছুটে চলেছে সামনের দিকে; পিছনে ফিরে দেখার যেন তার অবকাশ নেই। বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজের প্রাক্তনীরা জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকলেও বছরে অন্তত একবার এই পত্রিকা হাতে পেলে, হারানো দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাবার জন্য একটু সচেষ্ট হতে পারবেন, কলেজের সঙ্গে যোগসূত্রটি শক্ত করার সুযোগ পাবেন – এই আশা করাটা বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

শিকড় ও আত্মবিস্তারের ভারসাম্যই যে-কোনো সভ্যতার আদর্শ এক ধর্ম। প্রাক্তনীদের আত্মা তাই হোক ব্লটিং পেপারের মতো। ভালোটুকু শুষে নিতে হবে। সত্যকে মেনে নিতে শিখতে হবে সহজে। বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পুনর্মিলন উৎসবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগ সফলতা অর্জন করুক।

ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)
মানকর কলেজ

স্মৃতির পাতায় মানকর কলেজ

আঞ্জুমান লিপি

(প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজ)

২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ আমি মানকর কলেজে প্রথম যাই, কলেজটি দেখে আসার জন্য। অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহাস্য আন্তরিক ব্যবহার, কল্লোলদার অভ্যর্থনা, নীহারদার সুমধুর কথা ও কুসুমদির নীরব মিষ্টি হাসি আজও আমার জীবনে অমলিন। সেদিন ভাষাদিবস উপলক্ষে শহিদ বেদিতে ফুল দেওয়ার সময় আমার হাত থেকে ফুল পড়ে যাওয়ায়, কয়েকজনের হাসির আওয়াজটিও অবশ্য আমি ভুলি নি। কলেজে জয়েন করেছি সামার রিসেসের সময়, জুন মাসের ৭ তারিখ। তখন কলেজের WhatsApp Group-এ আমায় অভ্যর্থনা জানানো হয়। আর কলেজের শেষদিনে(৩১/০৮/২০২১) আমায় বিদায় জানানো হয় Google Meet-এ, কোভিদ এর জন্য। এইভাবেই মানকর কলেজে আমার প্রথম ও শেষদিন কোথাও যেন এক হয়ে যায়।

মানকর কলেজ আমার জীবনের তৃতীয় কর্মক্ষেত্র। ফারাক্কা কলেজে প্রথম আমি পার্টটাইম টিচার রূপে কাজ করি, তারপর স্কুলে প্রায় বারো বছর কাটানোর পর মানকর কলেজ। তাই কলেজের প্রথম দিনগুলো আমার মোটেই ভালো কাটে নি। এই কলেজের স্টাফরুম খুব মনোরম, সহকর্মীদের ব্যবহার খুব সুন্দর ও আন্তরিক। তবু প্রায় বারো বছর যাদের সঙ্গে কাটিয়েছি তাদের অভাব, তাদের স্মৃতি আমায় অন্তরে অন্তরে তাড়িত করতো। তাই আমি প্রথমদিকে খুব একটা কথা বলতাম না। তবে আমার পাশের চেয়ারে বসা শুকদেব, তার সহজ-সরল-আন্তরিক আলাপচারিতায় আমার জড়তা অনেকটা কাটিয়ে তুলেছিল। বর্ধমান থেকে মানকর পর্যন্ত ট্রেনে যাতায়াতের পর্বটিও, প্রথম দিকে আমার কাছে মোটেই সুখের ছিল না। অথচ আজ আমি মানকর স্টেশনে ট্রেনলেটের আড্ডাটি ভীষণভাবে মিস করি, মিস করি স্টেশন সংলগ্ন মিষ্টির দোকানের গরম মিষ্টি ও সিঙ্গারাকে। অদ্ভুদ জীবনের ধারা, যা একসময় সবচেয়ে বিড়ম্বনার বিষয় ছিল, তাই-ই কখন যেন অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে।

তবে মানকর কলেজের ইতিহাসে সেইসময় একই সঙ্গে দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও পরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন রীতি নিয়ে একটা চাপের ব্যাপার থাকলেও, আমার ছাত্রছাত্রীরা ছিল খুব স্পেশাল। স্টাফরুমে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি অনেক দেরিতে, কিন্তু ক্লাসের মধ্যে তারা আমায় অতিপরিচিতের ঘেরাটোপে ভোরিয়ে রাখতো, আমার সমস্ত জড়তা থেকে আমি মুক্তি পেতাম। তাদের উপস্থিতির হার, পড়ার প্রতি আগ্রহ আমায় লাইব্রেরীতে বেশি বেশি সময় কাটাতে অনুপ্রাণিত করতো। আমি নিজে যখন গ্রাজুয়েশন করি, তখন NET, SET ব্যাপারগুলো জানতামই না। কিন্তু তারা অনেক বেশি সচেতন। তাই তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী NET-এর সিলেবাসের অন্তর্গত যেসমস্ত গ্রন্থ গ্রাজুয়েশনের সিলেবাসে ছিল, সেগুলো বেশি জোর দিয়ে পড়াতাম। তাই হয়তো চঞ্চল ও সন্দীপের

মত অনেকেই মানকর কলেজের মুখ উজ্জ্বল করে চলেছে। তাদের সকলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। তাদের আমারা কতটা দিতে পেরেছি জানি না কিন্তু তারা আমাদের শিক্ষকসত্ত্বাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

ভাষা নিয়ে আমার এখানে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হতো। মেহের ভায়ের দ্রুত উচ্চারণ আমি অনেক সময় বুঝতে পারতাম না। স্টুডেন্টদের লোকাল টানও আমার প্রথম দিকে বুঝতে অসুবিধা হতো, তাই ঝুম্পা-ঝুম্পাদের বলতাম, একটু ধীরে বলতে। অথচ পরবর্তীতে কখন বর্ধমানের সেই নিজস্ব কথ্যরীতিকে ভালবেসে ফেলেছি, তা বুঝতেই পারি নি।

মানকর কলেজে আমার আর একটি বড় পাওয়া কলেজের সোশ্যাল উপলক্ষে স্টল তৈরির উন্মাদনা। স্টলের থিমের ভাবনা, পোশাকের ধরণ ও কালার নির্বাচন, স্টুডেন্টদের কর্মমুখরতা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পরিচিত গণ্ডিকে ভেঙে ফেলত। তখন আমাদের মধ্যেকার টেবিল ও ডেস্কের ব্যবধান উঠে গিয়ে, পাশাপাশি পথচলার আনন্দ অনুভূতিতে ভোরে উঠত সকলে। মিস করি আমি তোমাদের অমিত, অম্বিকা, রিয়া, কস্তূরী, দীপ, অর্পণ, শেনাদ্রী, অনিমেষ, দিবাশ্বরী, তিথি, সুমনা, সমাপ্তি..........................।

এই কলেজে আমার সবথেকে বড় পাওয়া, আমার প্রিয় ভাই অরিজিৎ। বাংলা বিভাগের HOD-এর দায়িত্ব নিয়ে কল্লোলদা যখন আমায় রুটিন করতে বলেন, তখন আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। আমি অনুভব করি স্কুলের সঙ্গে কলেজের বিস্তর পার্থক্যের জায়গাগুলো। আমি জানতাম কলেজে পড়াশোনা করবো এবং পড়াবো, এটাই একজন সহকারী অধ্যাপকের কাজ। কিন্তু রুটিন করা থেকে শুরু করে বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব পালন, NAAC-এর কাজ, সেমিনার - আমি যেন চোখে অন্ধকার দেখি। তবে কাজলদা, মেহের ভাই ও বনশ্রী আমার পাশে ছিল। তাঁদের সার্বিক সহযোগিতায় আমি বাংলা বিভাগকে চিনতে ও বুঝতে পেরেছি। আপনাদের আন্তরিকতা ভোলার নয়। কিন্তু অরিজিৎ যখন সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে, সহাস্য মুখে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে কঠিনকে সহজ করে নেয়, আমি তখন মুক্তি পাই। বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব নিজে পালন করে, যখন সে আমায় সই করতে বলে, তখন আমার মনে একটা সংকোচ দেখা দিত। কিন্তু তার সেই মিষ্টি হাসি ও আন্তরিকতায় আমি সব ভুলে যেতাম। ভালো থেকো ভাই, এই কামনা আমার নিরন্তর। ক্লাস নেওয়ার পাশাপাশি UG ও PG-র দায়িত্ব পালন, ইন্টারনাল এক্সাম, স্টুডেন্টদের স্বার্থে আত্মনিয়োগ, সেমিনার - একটি মানুষ একইসঙ্গে কতটা দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করতে পারে, তা সে আমায় শিখিয়েছে। আমি তখন আমার কাঙ্ক্ষিত ক্লাসে সময় দিতে পারতাম পুরোপুরি। অনেকসময় অন্য টিচার না এলে, তাঁর ক্লাসটিও আমি বা অরিজিৎ নেওয়ার চেষ্টা করতাম। স্টুডেন্ট কত দূর দূর থেকে ক্লাস করার জন্য কলেজে এসে ফিরে যাবে, সেটা মেনে নিতে পারতাম না। অনেক সময় মেহের ভাই বলতো, দিদি আর কতদিন পারবেন, এইভাবে অনবরত ক্লাস করলে যে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। কোভিদের মধ্যেও যথাসাধ্য অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কতটা পেরেছি জানি না।

সেদিন ৩১-শে অক্টোবর, ২০২১। মানকর কলেজে আমার শেষদিন। অরিজিৎ বাংলাবিভাগের সমস্ত টিচার ও স্টুডেন্টদের নিয়ে, বিভাগের পক্ষ থেকে অনলাইনে বিদায় জানিয়েছে আমায় খুবই আন্তরিকভাবে। তাঁর বানানো ভিডিওটি সেদিনের মত আজও আমায় সিক্ত করে নানাভাবে। তবে আমি অনেক বেশি কেঁদেছিলাম পরের দিন সকালে, কালিয়াচক কলেজে যোগ দেওয়ার দিন। বুঝেছিলাম মানকর কলেজের আজ আমি প্রাক্তনমাত্র। জানি না কখন এই কলেজ আমার প্রিয়ভূমি হয়ে উঠেছিল। মানকর আমায় অনেককিছু দিয়েছে, অনেককিছু শিখিয়েছে। এখান থেকেই আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির জন্য ভর্তি হই। অধ্যক্ষ মহাশয় থেকে শুরু করে আমার অন্যান্য সহকর্মী বন্ধুরা আমায় নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। সকলের জন্য রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

কলেজের বাংলা বিভাগে আয়োজিত সেমিনারগুলোর সাফল্যে অরিজিতের ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সকলের সহযোগিতা প্রশ্নাতীত। তবু একটা সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরঃ জীবন ও সাহিত্য'-এ আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম গবেষণাপত্রগুলো প্রকাশ করার, তা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। মাঝে কোভিদ এবং আমার চলে আসা এর একটি বড় কারণ। একটা অপরাধবোধ তাই আমার মনের ভেতর অস্বস্তি বয়ে আনে। স্টুডেন্টদের দেওয়া এডুকেশনাল ট্যুরের প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করা হয় নি। তাদের সেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আজও আমায় তাড়া করে। জীবনের সব ইচ্ছে সবসময় পূরণ হয় না, আমাদের সেই অপারগতা তাদের হয়তো এই শিক্ষাও দিয়ে যায়। জীবনের বৃহত্তরক্ষেত্রে তোমাদের সব স্বপ্ন পূরণ হোক, এই কামনা করি।

আজ বিভাগে পুনর্মিলনের ডাক পেয়ে আমার মন আবেগতাড়িত, আনন্দিত আবার ভারাক্রান্তও। সকলের সঙ্গে দেখা হবে এই আনন্দের পাশাপাশি স্মরণে আসে, এই মিলন একেবারেই ক্ষণিকের। তবু এই ক্ষণিকের দেখা যে আমাদের স্মৃতিকে জলসিঞ্চন করে বাঁচিয়ে রাখবে, নতুন স্মৃতি গড়ে তুলবে, এটাও নিঃসন্দেহে অনেক বড় পাওয়া। বাংলা বিভাগের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

মানকর কলেজের বাংলা বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছিল আমার দুটো ভাই, অমিত ও প্রতিম। দুজনের আন্তরিক সহযোগিতা ও দক্ষতায় বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অনেক উপকৃত হয়েছে। অমিত আজ আমার মতোই প্রাক্তন। তবে এই কলেজের বাংলা বিভাগে জুড়েছে আরও দুটো পালক - অরিন্দম ও প্রবীরদা। তাঁদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার নেই কিন্তু তাঁরা আমার বড়ই আপন। মানকর কলেজের বাংলা বিভাগের জন্য রইল আমার নিরন্তর শুভকামনা। শুভকামনা রইল কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় ও সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের জন্য। অধ্যক্ষ সুকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়, কল্লোলদা, নীহারদা, কুসুমদি, মামনিদি, সুব্রতদা, শ্রাবণীদি, সাথী, মিমাসা, পল্লব, সুমন, রুপালী, সুতপা, সোমনাথ, বিকাশদা, রবিদা, বড়বাবু, জামিরদা... প্রত্যেকে আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এঁদের কাউকেই ভোলার নয়। স্মৃতির রেখায় অমলিন হয়ে রইল মানকর কলেজের সকলেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তোবা নামগুলো মলিন হয়ে আসবে, কিন্তু চেহারাগুলো থাকবে মনের মণিকোঠায়। স্মৃতির ঢেউ কিন্তু অগণিত, এখানে তুলে দিলাম একটি আঁজলামাত্র। ভাল থাকুক মানকর কলেজ, ভাল থাকুক বাংলা বিভাগ, ভাল থাকুক সকল বর্তমান ও প্রাক্তনি।

আমার প্রাণের মানকর কলেজ

নির্মাণ পাল

মানকর কলেজ এই নামটি উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যেন একটা শিহরণ খেলে যায়। সমাসোক্তি অলংকারের ব্যঞ্জনায় বলা যায়, এই কলেজ আমার দ্বিতীয় জন্মদাতা। আমার পারিবারিক, গ্রামীণ এবং আত্মীয়-স্বজনকেন্দ্রিক যে পরিচিতি, তার বাইরে যেটুকু সুধীমহল আমায় চেনে, জানে, ভালোবাসে— তার প্রধান কাণ্ডারী আমার হৃদয়ের মানকর কলেজ।

আজ থেকে প্রায় ২২ বছর আগে সেই সময়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রী নারায়ণচন্দ্র গড়াইয়ের অনুমতিক্রমে ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর সুযোগ পাই। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছর এই কলেজের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি। কলেজে প্রবেশ করেই ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর প্রচুর সংখ্যা দেখে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' এইরকম অবস্থা হয়েছিল আমার। সেই সময়ের গুণী অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এত স্নেহের সঙ্গে সবকিছু অভাব,ত্রুটিকে সংশোধন করিয়ে নিয়েছিলেন, যা অনির্বচনীয়। অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর নিজের জন্য আনা টিফিন কত আন্তরিকভাবে খাওয়াতেন। সেকথা আজও মনে পড়ে। প্রথম ক্লাস নিতে যাব, কীভাবে রোল কল করতে হয় সেটাই জানা ছিল না। ছবি দি' স্নেহের স্পর্শ মাখিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন। এখন তিনি আমার বর্তমান কর্মক্ষেত্র এলাকার মধ্যেই রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ। তবু তো তিনি আমার কাছে ছবি দি' আজও। বড় মনে পড়ে কল্লোল স্যার, নীহার স্যারের কথা। কল্লোল স্যারের একাধিকবার দৌড়ে ট্রেন ধরা, আমাকে শিখিয়েছে কেমন করে জীবনের কর্মক্ষেত্রে দৌড়াতে হয়। স্যারের সাথে ট্রেনে বর্ধমান যেতে-যেতে ছন্দ-অলংকার-সাহিত্য নিয়ে কত আলোচনাই না হত। নীহার স্যারের পাশে যখন স্টাফরুমে বসতাম তখন বারে-বারে অনুভব করতাম যেন আমার অভিভাবকের কাছে বসে আছি। তরুণবাবু, মানসবাবু আজও উজ্জ্বলভাবে হৃদয়ে জাগরূক আছেন। তরুণ বাবুর সদা হাস্যময় বাক্যালাপে শেখার চেষ্টা করতাম-- জীবনকে কতখানি আনন্দে রাখতে হয়। মানসবাবু কমার্সের স্যার হয়েও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মানসবাবু সক্রিয় ভূমিকা নিতেন। মনে পড়ে শুক্লাদি', গোপাদি', কুসুমদি'র কথা। কী সরল প্রাণের এই মহীয়সী তিন মহিলা! গোপাদি' বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। স্টেশন থেকে আমার কলেজ আসা-যাওয়ার সুবিধার জন্য দিদি সাইকেলটা দিয়ে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগে যোগদান করার পরেও গোপাদি'র সঙ্গে একবার সামনাসামনি দেখা হয়েছিল। অনেক কথা হলো কিন্তু কোনো পরিবর্তন দেখিনি।

এক সময় আমার মাতৃবিয়োগ হলে কলেজের পক্ষ থেকে নীহার বাবু এবং অমিতাভ বাবু আমার বাড়ি গিয়েছিলেন। আমার সেই দুঃখের দিনে তাঁরা আপন জনের মতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই দিনগুলির কথা কী ভুলে থাকা যায়!

অমিতাভ বাবু ছিলেন ইতিহাস বিভাগের। ছেলেমেয়েরা যেমন ভয় করত, শ্রদ্ধাও করত সেই রকম। এত ভালো মানুষটি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন! তাঁর এই চলে যাওয়া হয়তো নিয়তির পরিণতি। কিন্তু মন থেকে মানতে বড় কষ্ট হয়! আপনি যেখানেই থাকুন স্যার-- ভালো থাকবেন। কমার্স বিভাগের যে কাজল দা' ছোটবেলা

থেকেই আমার কাছে শ্রদ্ধেয়; আমার চরম দুঃখ-বিপদের দিনে উদ্ধারের কাণ্ডারী; সেই মানুষটিও বড় অসময়ে চলে গেল।

মনে পড়ে রবি দা', বিনোদ দা', বিকাশ দা', জিতেন দা', অমর দা', বিজয় দা', রামপদ দা' এবং নিমাই দা'র কথা। নিমাই দা' মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে এসে কলেজ নিয়ে অনেক গল্প করেন। নিমাই দা'র মাধ্যমে বর্তমান কলেজের কেমন উন্নতি হচ্ছে; কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় সুকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় কতখানি কর্মোদ্যোগী হয়ে তাঁর সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সব খবর পাই।

এবার বাংলা বিভাগের কথায় আসি। কলেজে পড়াশোনা কেন্দ্রিক সহযাত্রী হিসেবে পেয়েছিলাম শ্রদ্ধেয় হাবিব দা'কে। অনেক কিছু শিখেছি হাবিব দা'র কাছে। এই একমাস আগে দেখা হলো, কথা হলো-- মানুষটির ব্যবহার সেই একই রকম আছে। এছাড়াও পেয়েছি সৌমেন, বিশ্বদেব, সাহাদাত, এবং কল্যাণকে। কল্যাণ পূর্ব থেকেই আমার ছাত্র ছিল। কল্যাণ কলেজে পড়ানোর সুযোগ পাওয়ার পর বর্ধমানে আমরা দু'জনে একই সঙ্গে থাকতাম। কলেজ এবং বাংলা বিভাগ নিয়ে কত কী চিন্তা-ভাবনা করত কল্যাণ।

সর্বোপরি যে নামটি হৃদয়ে গাঁথা আছে তিনি হলেন আমার বীথিকা দি'। দিদির মুখে হাসি ছাড়া কোনোদিন বিরক্তি দেখিনি। কত-কত ভুল করতাম; কিন্তু স্নেহের স্পর্শ দিয়ে তিনি সবকিছু হাসিমুখে মানিয়ে নিতেন। মনে পড়ে একটি মজার ঘটনা-- দিদি অনার্সের হেড এগজামিনার। আর খাতার স্ক্রুটিনি করার জন্য আমাকে এবং সৌমেনকে ডেকেছেন। কত যত্ন করে নিজের সামনে বসিয়ে খাইয়েছেন। আর আমরা এমন দায়িত্ব সম্পন্ন যে, খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে খাতার স্ক্রুটিনি করার পরিবর্তে একটানা ঘুমিয়ে নিলাম। সে দৃশ্য দেখে দিদির কী হাসি! কোনো শাসন নেই, শুধুই স্নেহ। আজও মনে পড়ে সেই সব চালচিত্র।

এবার আসি পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা বিভাগের কথায়। রামতনু, ঝর্না, কাজল দা'-- বাংলা বিভাগের ধারাবাহিক ঐতিহ্যকে এক সময় দায়িত্ব সহকারে বহন করেছে। রামতনু এবং ঝর্না আমার স্নেহের ছাত্র-ছাত্রী আর কাজল দা' আমার অন্য রকম শুরু। এই মানুষটি সংস্কৃতি জগতের বড় গুণী মানুষ। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে কাজল দা'র কাছে সঠিক উচ্চারণ, স্বরক্ষেপন শিখে নিয়ে স্টেজে উঠে যে সফলতা পেয়েছি, সেখানে তাঁর আন্তরিক অবদান বিস্মৃত হবার নয়। 'বিসর্জন' নাটকের খুব ভালো রিহার্সাল দিয়েও আমাদের অভিনয়টা আর হয়ে উঠল না। এখন বাংলা বিভাগে পড়াচ্ছে আমার দুই ছাত্র-ছাত্রী বনশ্রী এবং মেহের। এদেরকে মানকর কলেজে পড়ানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এবং হয়তো ওদের সৌভাগ্য এই যে, আজ তারাও সেই কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপিকা। মেহের কতটা লম্বা হয়েছে জানিনা-- অনেকদিন দেখা নেই। বনশ্রী সম্পর্কে বিশেষভাবে বলতে হয়, ওদের অনার্সের ব্যাচে বনশ্রী ধারাবাহিকভাবে প্রথম স্থান অধিকার করত।

কলেজে বর্তমানে বাংলা বিভাগে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন অরিজিৎ স্যার। কয়েক বছর পূর্বে স্যার কাঁচরাপাড়া নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে(K.N.U.) যখন পড়াতেন তখন থেকেই খুব ভালোভাবে চিনি। এত হাসিখুশি একজন মানুষ-- দেখে বড় হিংসে হয়। এই রকম নির্মল হাসি আমার আসে না কেন? এই মানুষটা রেগে গেলে মুখ-চোখের ভাব কেমন হয় সেটা একবার দেখার ইচ্ছা রইল। উনি শুধু কলেজের ক্ষেত্রেই নন, মানকর এলাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে আছেন। এটা মানকরবাসীর কাছে বিরাট পাওয়া। শ্রদ্ধা জানাই অরিজিৎ স্যার, প্রবীর স্যার, প্রতীম স্যার এবং শিখা ম্যাডামের প্রতি। প্রত্যেকেই আমার কাছে শ্রদ্ধেয়।

ওনারা বাংলা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর পঠন-পাঠনের মান নিত্য ত্বরান্বিত হচ্ছে। এখন আবার বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। কলেজের ক্ষেত্রে এটিও একটি নূতন স্বর্ণপালকের সংযোজন বলা যেতে পারে। আশেপাশের গ্রামীণ এলাকার সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য এ এক চরম পাওয়া।

এই সমস্ত গুণী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সংস্পর্শে এসেই কলেজের বাংলা বিভাগ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা NET, SET, JRF সহ NET-এর মত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। ভবিষ্যতে সেই সংখ্যাটা আরো অনেক বাড়বে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সর্বোপরি কলেজের ছেলে-মেয়েদের কথা না বললে সব কিছুই অপূর্ণ থেকে যায়। ইদানিং বাতাসে একটা কথা ভেসে বেড়ায়-- বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে শ্রদ্ধা, স্নেহের সম্পর্ক আর আগের মত নেই। মানকর কলেজের ধারাবাহিক শিক্ষার প্রবহমানতাকে অনুভব করলে এ কথা মিথ্যা বলেই বিশ্বাস জন্মাবে বলে আমি মনে করি। এই কলেজের ছেলেমেয়েরা একাধারে শাসন, স্নেহ এবং শ্রদ্ধার যোগ্য।

এই প্রথম কলেজের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। বাংলা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে মধুর ঐতিহ্যময় সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বহমান; এই পুনর্মিলন তার বাহ্যিক একটি প্রকাশ মাত্র। এই ভাবেই 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে' ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্রোত আসবে-যাবে; মানকর কলেজ এবং কলেজের বাংলা বিভাগ জাগরূক থাকবে।

ধন্যবাদসহ--
নিত্য শুভার্থী
নির্মাণ পাল
মানকর, পূর্ব বর্ধমান
দিনাঙ্ক-- ৩০/০৪/২০২৩

আয় পাখি, ঘরে আয়

অরিন্দম অধিকারী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সময়ের স্রোতে আমরা সবাই মহাকালের যাত্রী। এই মহাকালের তাড়নায় আমরা কখন যে নিজেদের ঘর ছেড়ে ঝাঁপ দিই জন্ম-মৃত্যুর খেলায়, নিজেরাই বুঝতে পারি না। জন্ম-মৃত্যুর খেলাকে ছাপিয়ে যেতে পেরেছেন যেসব সাধকেরা, তারাই বোধহয় বুঝতে পারেন সময়ের এই অমোঘ আকর্ষণকে। আমরা শুধু ঘর ছেড়ে বের হই, আর নিজের কর্ম শেষ হলে নীড়-হারা পাখির মতো ছটফট করি ঘরে ফিরবো বলে। মায়ের ঘুম পাড়ানি গানের মতো মহাকালের ওপার থেকে কেউ বোধ হয় ক্রমাগত ডাকতে থাকে। যাদের প্রাণপ্রিয় আদরমাখা স্নেহ এড়াতে পারি না।

আসা-যাওয়ার এই খেলা চলতে থাকে সারাজীবন জুড়ে। সময়ের স্রোতে ক্রমাগত নতুনেরা হয়ে পড়েছে পুরনো। আর এই স্রোতে ভাসতে ভাসতেই পুরনোরা পুনরায় কোথাও প্রবেশ করছে নতুন রূপে। এভাবেই আমরা আজ ফিরে দেখতে চেয়েছি আমাদের মহাকালের পুরনো রথযাত্রীদের। যারা এই প্রতিষ্ঠানে এসেছিল নিজের রথের সারথী হয়ে উঠতে। অর্জুনের মতো কৃষ্ণের সারথ্যে জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করতে চায়নি তারা। তাদের এই বিরাট কর্মযজ্ঞে আমাদের শুভকামনা ছিল নিরন্তর।

দেখতে দেখতে এই আদরের বিভাগের বয়স হয়ে উঠল অনেকখানি। মহাকালের বিরাট আয়োজনের মাঝে এই সময় অতি নগণ্য। তবু আমরা কাল-স্রোতের এক পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাক দিতে চেয়েছি সেই সব পাখিদের, যারা জীবনের একটা সময় ঘর মনে করেছিল বিভাগটিকে। তাদের স্মৃতির দরজাগুলি খুলে দিতেই আমাদের আহ্বান, "আয় পাখি, ঘরে আয়"। তাদের এই ঘরে ফেরা মহাকালের বুকে ছোটো হলেও একটা দাগ কেটে যাক, এই কামনা রইল নিরন্তর।

এখনও

প্রবীর কুমার পাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এখনও পূর্ব দিকেই সূর্য ওঠে।
ভোরের আকাশে পাখিরা গান গায়,
কোদাল হাতে চাষী যায় মাঠে,
শিশুগন মন দেয় নিজ নিজ পাঠে।
শুরু হয় নিত্য দিন নিত্য কাজ
মানুষের আনাগোনা।

এখনও দুপুর হয়
বেলা বাড়ে, কোলাহলে ভোরে যায় আকাশ বাতাস,
সূর্যের তাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
বাড়তে থাকে ধুলিকণা, আবর্জনার স্তূপ।
তবুও দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় মানুষ।

এখনও বিকেল হয়
পড়ন্ত বেলায় শকুনির ডানা মুছে দেয়
রাঙা গোধুলির সিঁদুরের টিপখানি।
ঢলে পড়ে সূর্য মৃত্যুর গহন গভীরে।
লাভ-ক্ষতির হিসাব চুকিয়ে
ঘরে ফেরে যতসব হাটুরের দল ।

এখনোও সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি হয়।
সব পাখি বাসা খোঁজে,
দিশাহারা নাবিক কেবলই মাথাঠুকে মরে।
সুদূর আকাশে মিটিমিটি তাকায় তারারা।
নীরবে নক্ষত্রলোকে বসে আদালত ,
বিচারের বানী ফিরে ফিরে আসে
মহাশূন্যে মহালোকের পথে।

সুখের মোড়ক

অমানিশা

সুখের মোড়কে দুঃখকে ঢাকা –
সব দুঃখীর জানা;
নিঝুম সকালের আলতো বাতাস
হয়তো শিখিয়েছিল আমাকে,
কিংবা বাবার চোখ রাঙানি –
'যা আছে তাই খা'।
শক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, ডান হাতের পেশি
শক্ত করে কয়েতের দাঁত জোড়াকে চেপে
মনে মনে বলেছিলাম–'জিতব আমি'।
নাক ফুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম বাড়ি থেকে।
আলাপ হয়েছিল বড় লোকের আলালের
ঘরের দুলাল –এর সঙ্গে, যে যাচ্ছিল
Shopping Market। আর আমি?
খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে সেলস ম্যানের চাকরি খুঁজতে।
ছাত্র হিসেবে প্রথম থেকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়তাম
মাঝে মাঝে জিততাম, একেবারে হারিনি কখনো।
জমির নম্বর কোনও বছর এক কিংবা দুই;
একবার শিক্ষক মশায় ছ' নম্বরে নাম ডাকলেন
দুঃখ হয়েছিল ভীষণ।
কিন্তু বুঝতে দিইনি কেননা
সুখের সে কী আবরণে দুঃখকে
ঢাকতে জানি বলে।

সম্পর্ক বদলে যায়!

সেখ মেহের আবদুল্লাহ

ভূমিষ্ঠ শিশুর ক্রন্দন চিৎকারে যেন
পিতার বুক টলে যায়
ক্রমে ক্রমে স্নেহে বাৎসল্যে বড় হয়ে ওঠে ছেলেটি।
যেন পিতার দীপ্তিতে আপনি দীপ্তিমান।
সন্তান যেন বাধ্য রামচন্দ্র
আর পিতা দশরথ। এক মধুর সম্পর্কের বন্ধন।

চাঁদের ডাকে সাড়া দেয়নি সে পিতা
পাখির গানেও মেতে ওঠেনি কখনও
নজর ছিল সন্তান পালনের পুণ্য কর্তব্যে।
পিতা ছিল বৃক্ষের মত দয়ালু, উদার।

সুখের সংসারে হঠাৎ আসে কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়া।
সব ওলট পালট করে দেয়,
নিভিয়ে দেয় সুখ সংসারের গৃহিনীর প্রাণের দীপ শিখা
মাতৃহারা সন্তান পুরপাক খায় ঘূর্ণাবর্তের মতো।

চাঁদের ডাকে সারা না দেওয়া পিতা
একদিন সপ্তপদীর আসরে
পূত মন্ত্র পাঠ করে ঢুকে পড়ে আর এক নতুন দুনিয়ায়
ছুটে চলে ব্যক্তি স্বার্থের মধুঃ কামনায়।
এবংর তারপর –
মাত্র একটা পূর্ণিমা পেরিয়ে যেতেই

সুখের ঘরে ঢুকে চির অন্ধকার,
স্বপ্ন ভঙ্গ হয় সন্তান সপ্ততির
হিসাবের খাতায়, হয় গড়মিল
কারণ সম্পর্ক যে বদলে যায়।

শুভেচ্ছা বার্তা

বনশ্রী দত্ত

'পথের বিলাস যায় পথে পথে বিলাতে বিলাতে'—উদ্ভূত কিছু যদি থাকে তাকে তুমি স্মৃতি নামে ডেকো, সেই স্মৃতির ডাকে সাড়া দিতেই আগামী ৩০শে এপ্রিল মানকর কলেজ প্রাঙ্গন সাক্ষী হতে চলেছে বহু প্রতিক্ষীত এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের যা আমাদের কাছে স্বপ্ন ছিল তা পূরণ হতে চলেছে বিভাগের উদ্যোগে। আর আমরা বাংলা বিভাগই একমাত্র সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার সুযোগ লাভ করেছি। আমার সঙ্গে সম্পর্ক যদিও ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত একজন বাংলার অধ্যাপিকা রূপে কিন্তু এই বাংলা বিভাগের সঙ্গে পরিচয় আমার ২০০০ সাল। আমি ২০০৪, এর প্রাক্তনী তাই কলেজের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আমি আস্বাদন করি আমার আকো আমার অনুভূতি দিয়ে কলেজ আর আমি উভয়েই উভয়ের সাথে অনেক মায়ার বন্ধনে জড়িত আমার মতো অনেক প্রাক্তনী আছে যা এই কলেজের সাথে একই সূত্রে গ্রথিত আর অনেকেই স্বপ্ন দেখে যদি একটা দিন ফিরে পেতাম কলেজ ক্যাম্পাস, ক্যান্টিন, বিশুদার ফুচকা, লাইব্রেরী আর পুরনো সেই বন্ধু বা স্যার ম্যাডামদের। আমি জানি আমার মতোই তাদের আরো অনুভূতিরা ফিরে পেতে চায় সেই সোনালী দিনগুলোকে সবাই যেন কবির সুরে গাইতে চায় –

'আর আরেকটি বার আয়রে সখা প্রাণের মাঝে আয় ভরে, সুখের-দুঃখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তায়'।

প্রাক্তন-প্রাক্তনীদের অনুভূতির স্পন্দন গায়ের ছন্দ যেন নতুন পরম্পরা গড়ে তোলে আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর আর সাফল্যের অন্তহীন বিলাসিতা যেন পাথেয় হয় তাদের।

আর মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় বিভাগীয় প্রধান ও আমার অন্যান্য বিভাগীয় সহকর্মীদের উদ্দেশে শুধু বলা –

ভালো থাকা শুধু নয়। মানুষকে ভালো রাখার মতো দুর্লভ সৌভাগ্যে সমৃদ্ধি হোক আপনাদের জীবন।

শুভেচ্ছা বার্তা

প্রতিম দত্ত

অনেক সময় নৈকট্য দৃষ্টিহীনতার নামান্তর। খুব কাছ থেকে আমরা যা দেখি বারবারই মনে হয়, তা কেবল খন্ডিত দেখা। ঠিক মতো দেখার জন্য দূরত্ব প্রয়োজন। কাছ থেকে দেখার মধ্যে অনেক কিছু জড়িয়ে থাকে। তাই খাঁটি দেখার জন্য একটু দূরে যেতে হয়। তাইতো সঞ্জয়কে প্রয়োজন হয় ধৃতরাষ্ট্রের কিংবা অর্জুনের প্রয়োজন দিব্যদৃষ্টি। 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাওয়ার মূল উদ্দেশ্যটা হল নিজের অক্ষমতা জানানো। আসলে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানতো এখনও আমার বর্তমান। অতীত নয়। মানকর কলেজের সঙ্গে আমার প্রাত্যহিকতার সম্পর্ক। একে নিয়ে লেখা খুব কঠিন। এ এক নৈকট্যজনিত সীমাবদ্ধতা। তাই এই না লিখতে পারার কথাটুকু লেখা থাক। মানকর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলনের এই উদ্যোগে আমার শুভেচ্ছা রইল। তাঁদের স্মৃতি চারণায় আমি আমার বর্তমানকেই আরো একটু বেশি চিনে নেওয়ার অবকাশ পাব।

অনন্তরাত্রি

শিখা হালদার

কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রির আকাশ একরাশ তারা নিয়ে পাহাড়া দিচ্ছে নিশ্চুপ পৃথিবীকে।
কালপুরুষ আর সপ্তর্ষির ম্রিয়মান উপস্থিতি যেন আবছা অতীত।
এক কঠিন নীরবতার কালো চাদর ঢেকে
ঘুমোচ্ছে বিশ্ব।
গাছের প্রতিটি পাতায় হিসেব চলছে
বেপরোয়া অতীতের।
প্রকৃতি নিশ্বাস নিচ্ছে গভীর প্রত্যয়ে
অনন্তের দাবি নিয়ে।
সেই গভীর রাত্রিকে ভেদ করে ভেসে আসছে
এক চাপা আর্তনাদ--অস্ফুট ক্রন্দন!
যেন কোনো মানবীর অসহ্য আবেদন--
যুগের উন্মত্ত অত্যাচারের
অসহিষ্ণু প্রকাশ।
সে কান্না বহুযুগ ধরে উপেক্ষিত হয়ে
আজ মিশে যাচ্ছে মৃত্যুরোলে।
মৃত্যুপুরীর অন্ধকার নেমে এসেছে বিশ্বজুড়ে।
মনে হল মা বসুন্ধরা আজ আবার কেঁদে উঠল
তার মৃত সন্তানদের কষ্টে।
তখনও আকাশজুড়ে কৃষ্ণরাত্রি--
রোগমুক্ত সকালের অপেক্ষায়।

বর্তমান বাঙালি মননে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সোমনাথ ধারা

অতীত আর বর্তমানের মধ্যে কত দুস্তর ব্যবধান! কালের পরিবর্তনের স্রোতে মানবের জীবনধারার, ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তন ঘটে —একথা সত্য। কিন্তু সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রটি যদি উৎকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টের দিকে ধাবিত হয় তখনই তা হয়ে ওঠে ভীষণ আক্ষেপের বিষয়। আর সেইরকম পরিবর্তন যদি সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, তবে তার পরিণতি হয়ে ওঠে ভয়াবহ। বলাবাহুল্য, আমাদের বর্তমান বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অবস্থাটা অনেকটা সেইরকম। আজকালকার অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলতে একরকম লজ্জা ও ঘৃণাবোধ করেন। তাই বাংলা ভাষায় কথা বলবার সময় প্রায় প্রতি বাংলা বাক্যের ফাঁকে ফাঁকে Okay, But, Because প্রভৃতি নানারূপ ইংরেজি শব্দ গুঁজে দেন। যাতে ইংরেজি ভাষার গর্বে গর্বিত হতে পারা যায়। অথচ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুকাল পূর্বেই বলে গিয়েছিলেন—"আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র।...নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়।" কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা! বাঙালি আজও ইংরেজের অনুকরণ করে চলেছে। ভবিষ্যতে যে তার কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটবে —একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না। তবে কেবলমাত্র ইংরেজি নয়, হিন্দি ভাষার প্রতিও আমাদের অনুরাগ নিতান্ত কম নয়। যে সমস্ত বাঙালির হিন্দি ভাষা সম্পর্কে সামান্যতম চেনা-জানা আছে তাঁরা বাংলা ভাষায় পরিবর্তে হিন্দি ভাষায় কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আবার এমনও অনেক বাঙালি আছেন যাঁরা বাংলা ভাষায় অতি সুন্দর ও সাবলীলভাবে বাক্য বিনিময় করতে পারেন অথচ কোনো ইংরেজিভাষী অথবা হিন্দিভাষী তাঁকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি ইংরেজি কিংবা হিন্দি ভাষা ভালোভাবে না জানা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ছেড়ে দিয়ে বিকৃত ইংরেজি বা হিন্দিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নকর্তাও উত্তরদাতার উত্তরের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেন না। আজকের দিনে এরকম মানুষের অভাব নাই, বরং যথেষ্টই আছে। অন্যদিকে যদি কোনো বাঙালি পরিশুদ্ধ সহজ সরল বাংলা ভাষায় কথা বলে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেন, তবে তাঁকে আমরা সম্মান তো করিই না; এমনকি তিরস্কার করতেও ছাড়ি না। এই সমস্তকিছুই বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের অবজ্ঞার পরিচয় বহন করে।

সাম্প্রতিক কালের অধিকাংশ বাঙালির ধারণা এই যে, তারাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করে যারা অন্য বিষয় নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায় না। তাঁদের মতে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চর্চা করা নিতান্ত বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করার ফলে তার ভবিষ্যৎ হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। অর্থাৎ পরিণত বয়সে কর্মের জগতে স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। যার সামান্যতম আর্থিক স্বাবলম্বন আছে সে তার সন্তানকে কখনই বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়ার পরামর্শ দেয় না। অনেক ক্ষেত্রে পিতা সন্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় জোর করে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্রের মোটা মোটা বই তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। সেইসব বই ছেলেটি পড়তে পারুক আর না পারুক কিংবা তার ভালো লাগুক আর না লাগুক —তাতে সন্তানের পিতার কিছু এসে যায় না। কেননা তাঁর বিশ্বাস, এইসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলেই ভবিষ্যতে অর্থোপার্জনের রাস্তাটি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে পিতা তাঁর

সন্তানের ভবিষ্যতে অর্থোপার্জনের দিকটায় দেখলেন, তাঁর সন্তান যে সেইসব বিষয় নিয়ে পড়ার জন্য কতটা প্রস্তুত, তা দেখবার প্রয়োজনই বোধ করলেন না। ফলে সেই ছেলেটি তার পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে না পারার জন্য মানসিক তৃপ্তি পায় না। তার নিজস্ব ভাবনা, মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রগুলি বিলুপ্ত হয়। হয়তো ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থোপার্জন করলেও মানসিক প্রশান্তি পায় না। আজকাল বাঙালি এতটাই অর্থোপার্জনের নেশায় মশগুল যে, 'সুখ' ও 'আনন্দ'-র পার্থক্যটুকু শনাক্ত করতে পারে না। তাঁদের ভাবনা, প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জন করলেই অসীম আনন্দের জগতে বিচরণ করা যায়। বাস্তবিক তা নয়, 'আনন্দ' এবং 'সুখ' —এই দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। আমরা প্রচুর অর্থোপার্জনের মধ্য দিয়ে হয়তো সুখী হতে পারি, কিন্তু আনন্দলাভ করতে পারি না। কেননা আনন্দ সম্পূর্ণরূপে মনের বস্তু। যা মনের বস্তু তা কখনো অর্থের কারাগারে বন্দী থাকতে পারে না। আনন্দলাভের জন্য সাহিত্যচর্চা আবশ্যক। কিন্তু তা নিয়ে আজকাল বাঙালি ভাবে না। সে কেবলই অর্থের পিছনে দৌড়ে চলেছে। বাংলা সাহিত্য চর্চা করে যেহেতু অতি সহজে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করা যায় না, তাই আজকের অধিকাংশ বাঙালি বাংলা সাহিত্য পাঠে বিমুখ।

২

বর্তমান বাঙালি সংস্কৃতির অবনমন কী হারে ঘটে চলছে, একটু চোখকান খোলা রাখলে সহজেই তা প্রত্যক্ষ করা যায়। আমাদের ভাবতে বড়ো অবাক লাগে, আজকের দিনে রবীন্দ্রসংগীতের অনুরাগী সহৃদয় শ্রোতা নেই। হয়তো কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। কিন্তু তার সংখ্যাটা খুব একটা বেশি নয়। যে রবীন্দ্রসংগীত এককালে বাঙালির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, সেই সংগীত আজ আর আমাদের টানে না। নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত শোনেন —এরূপ শ্রোতা আজকের দিনে খুঁজে পাওয়া প্রায় দুষ্কর। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজকের দিনে আমরা অধিকাংশ বাঙালিই নিয়মিত অন্তত একটা করেও রবীন্দ্রসংগীত শুনি না, অথচ স্যোশাল মিডিয়ায় অকারণে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করি। বাঙালি হিসাবে এটা আমাদের কাছে এক চরম লজ্জার বিষয়।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে বাংলার প্রাচীন লোকসংস্কৃতির নানা অঙ্গগুলি আজ বিলুপ্তপ্রায়। আমাদের জীবনের সঙ্গে এতদিন ধরে যেসমস্ত লোকসংগীত, লোকনৃত্য প্রভৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, আজকের এই ইন্টারনেটের দুনিয়ায় ঢুকে পড়ে তা থেকে আমরা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। ফলে আগেকার দিনে বাংলার যে মঞ্চে লোকগীতি, বাউল, ভাটিয়ালির মিঠে সুর ধ্বনিত হতো আজ সেই স্থানে প্রবেশ করেছে নানা কুরুচিপূর্ণ চটুল গান। আমরাও সেই কুরুচিপূর্ণ চটুল গান শুনতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, 'কাঁচা বাদাম...'—এর মতো ফালতু গান নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় মাতামাতি করি। সংগীতপ্রিয় বাঙালির রুচি আজ কোথায় গিয়ে উপনীত হয়েছে এই সমস্ত গান শুনলে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সম্প্রতিককালে অধিকাংশ বাঙালি রবীন্দ্র নৃত্য, লোকনৃত্য প্রভৃতি দেখে না। আজকের বেশিরভাগ সভ্য বাঙালি দেখে সেইসব নৃত্য, যা সাধারণ মানুষের মনে কুরুচিপূর্ণ মনোভাব জাগায়। ফলে আজকাল বাঙালির নৃত্যশৈলীর ধরণ বদলে গেছে। আজকের অধিকাংশ নৃত্যশিল্পীরা অদ্ভুত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে আকারে, ভাবে, ইঙ্গিতে কুরুচিপূর্ণ নৃত্যের মাধ্যমে অশ্লীল মনোভাবকে ব্যক্ত করে। আর বাঙালি সভ্য সমাজও এতটা নীচে নেমে গেছে যে, সেইসব নৃত্য দেখার জন্য মঞ্চের সামনে গিয়ে হুড়োহুড়ি করে। বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্রগুলির

অধিকাংশই হিন্দি, ইংরেজি অথবা দক্ষিণী চলচ্চিত্রগুলির অনুকরণ। অথচ অতীতের বাংলা চলচ্চিত্রে কোনো অনুকরণ ছিল না, ছিল মৌলিক চিন্তাভাবনার অভূতপূর্ব প্রকাশ। আর তাই সে যুগের অধিকাংশ বাংলা চলচ্চিত্র আজও সমান জনপ্রিয় এবং কালজয়ী সৃষ্টি হিসাবে বিবেচিত হয়। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। কিন্তু আজকের দিনের অনুকরণধর্মী চলচ্চিত্র বছর দু'য়েক অতিক্রান্ত হতে না হতেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়।

বর্তমান বাঙালির স্বাভাবিক রুচির অভাবেই বর্তমান বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই দুরবস্থা। আমরা সভ্য হতে গিয়েও শুধুমাত্র রুচিগত তারতম্যের কারণে ক্রমে অসভ্য হয়ে পড়ছি। ফলে আমাদের উন্নতির জায়গায় ক্রমশ ঘটে চলেছে অবনতি। প্রায় সকল বাঙালিরই এই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। বাঙালি যদি তার কুরুচিপূর্ণ মনোভাবগুলি বর্জন করে পুনরায় সুরুচিসম্পন্ন ওঠে, তাহলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুনরায় পূর্বের পর্যায়ে ফিরে আসবে —এটুকু আশা করা যায়।

মানকর কলেজ

সন্দীপ ঘোষ

"বিদায়" শব্দটি তিন অক্ষরের একটি ছোট্ট শব্দ হলেও তা বড় বেদনাদায়ক। সবকিছুরই যেমন শুরু আছে, তেমনি তার শেষও আছে।অবশ্য অনেক শেষই 'শেষ' হয় নতুন শুরুর অপেক্ষায়।জীবনে চলার পথে এক একটা ধাপ তৈরি করে উপরে উঠতে হয়, আর পিছনে ফেলে আসতে হয় সেই পুরনো দিনগুলো। কিন্তু তার স্মৃতি জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকে যায়।থেকে যায় হৃদয়ের স্মরণিকায়।

২০১৫ সাল, বাংলা বিষয়কে ভালোবেসে বাংলা অনার্স নিয়ে প্রথম প্রবেশ করলাম মানকর কলেজে। স্কুল পাস করে প্রথম কলেজে যাবার আগে মনে মনে ভেবেছিলাম,হয়তো কলেজে এত পড়াশোনা নেই। একটা ডায়েরি, একটা পেন, ব্যাস! মন হলে ক্লাস করব, না মন যায় করব না! এতে তো আর বাধা দেওয়ার কেউ নেই! ক্লাসের টাইমেও কলেজের গেট তো খোলাই থাকে সর্বক্ষণ, যখন খুশি এসো, যখন খুশি যাও।অফুরন্ত আনন্দের সাথে,অনেকটা সেই গাছের নতুন গজিয়ে ওঠা সবুজ পাতার মত আনন্দের সাথে প্রথম ঢুকলাম কলেজে। জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু হল। কিন্তু নতুন প্রতিষ্ঠান, বন্ধু নেই, স্যার-ম্যামদের সাথে পরিচয় নেই,নেই কোনো প্রিয়জন,যার সাথে নিরালায় বসে দু'টো মনের কথা বলবো।

দিনের শেষে মন খারাপের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরতাম প্রথম প্রথম।আবার কলেজ যাবার আগের ভাবনাগুলোও ভেঙে গেল। শুনলাম সেই ৭৫ শতাংশ ক্লাস করতেই হবে, সেই হাজারো সিলেবাসের ভার আবার মাথার উপর চাপলো। ডাইরি,পেন নয় সেই ভারী বইয়ের ব্যাগই উঠল কাঁধে, তার সাথে অনার্সের পড়ার একটা বিশাল চাপ।কিন্তু এ তো নতুন অধ্যায়ের এক পৃষ্ঠা মাত্র। এক পৃষ্ঠা শেষে শুরু হলো আর এক নতুন পৃষ্ঠা ।কিছুদিন এইভাবে কাটার পরে ধীরে ধীরে শুরু হতে লাগলো আনন্দের মুহূর্ত।আস্তে আস্তে কলেজের ক্লাসরুম গুলো বড় কাছের হয়ে উঠলো,একটা দুটো করে বন্ধু হতে হতে একটা পরিবার তৈরি হল। ঘর হল পরিবার হল আর অভিভাবক থাকবে না ? অভিভাবক হয়ে উঠল আমাদের বাংলা বিভাগের স্যার-ম্যামরা । সেই মন খারাপের সব ভাবনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

তখন আমি বাংলা অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কলেজ আর সেই প্রথম দিনের মত নেই, হয়ে উঠেছে আমার দ্বিতীয় বাড়ি। যেখানে আমার আর এক পরিবার আছে চঞ্চল, শিবরাম, উর্মি, রাবেয়া, দীপক, ইয়াসমিন, শবনম, প্রদীপ, অরিন্দম (এছাড়াও আরও অনেক প্রিয় বন্ধু) । আছেন স্যার-ম্যামেরা,শুধু স্যার ম্যাম নয়, অভিভাবক কাজল স্যার, বীথিকা ম্যাম, অরিজিৎ স্যার, বনশ্রী ম্যাম, আঞ্জুমন লিপি ম্যাম, মেহের স্যার। শুরু হল একদিকে জোর পড়াশোনা,ক্লাস, তার সাথে আরেক দিকে পড়াশোনার ফাঁকে প্রচুর আনন্দ, হাসি, মজা, খুনসুটি।

প্রথমদিকে যে কলেজে যেতে আমার মন চাইতো না,সেই আমারই আবার তখন কোন কারণে কলেজ না যেতে পারলে ভীষণ মন খারাপ হতে থাকলো।এভাবেই মিলেমিশে আনন্দের সাথে কাটছিল কলেজের দিনগুলি।

তৃতীয় বর্ষে এসে কলেজের পরিবেশ আমাদের মনকে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছিল। দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত কলেজ, ক্লাস, বন্ধু, স্যার-ম্যাম, ক্যান্টিন এসব ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতাম না।

সত্যি বলতে তৃতীয় বর্ষে এসে স্যার-ম্যামরাও যেন আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। ক্লাস , পড়াশোনা সাথে স্যার ম্যামদের সঙ্গে গল্প, আবার পড়া ধরার সময় না পারলে বকা,কান ধরে দাঁড় করানো এই সবতো ছিলই। টিফিনের সময় কলেজ ক্যান্টিনে খেতে যাওয়া একে অপরের টিফিন কেড়ে নেওয়া আবার কোন কারণে ক্লাস সময়ের আগে শেষ হয়ে গেলে রেলস্টেশনে এসে সবার আড্ডা শুরু।

এমনও দিন গেছে যে গল্প এতটাই জমে গেছে বাড়ি ফেরার ট্রেন সামনে দাঁড়িয়ে তাও বাড়ি ফিরিনি। বাড়িতে ফোন করে বলে দিয়েছি, "ক্লাস ছিল ট্রেন মিস হয়ে গেছে, পরের ট্রেনে ফিরব।"

পড়াশোনা ,আড্ডা, হাসি, ঝগড়া, মান -অভিমান, একটু আধটু মিথ্যা বলা এসব করতে করতেই হঠাৎ যে বিচ্ছেদের দিন এগিয়ে আসবে ভাবতে পারিনি।

এই আনন্দময় অধ্যায়টার যে ইতি ঘটবে ভাবতে পারিনি।

হ্যাঁ, দিনটা ছিল আমাদের সকলের কলেজ জীবনের শেষ দিন।

সকলেই আছি একসাথে, কিন্তু আনন্দটা চাইলেও যেন করতে পারছিলাম না। ভেবেছিলাম শেষ দিন মন খারাপ করব না ভীষণ আনন্দের সাথে হাসিমুখে বাড়ি ফিরব। কিন্তু তা বুঝি হলো না সকলে মাঠে বসে, সকলের চোখ ছলছলে। কিন্তু নিয়তির লিখন, এগিয়ে চলাই তো জীবন । সকলে নিজের মতো এগিয়ে চলবো সারা জীবন একসাথে থাকব এরকম প্রতিশ্রুতি করে সকলে উঠে পড়লাম, চোখের কোণা মুছে নিয়ে ছুটে গেলাম ক্লাসে, তারপর আমাদের মানকর কলেজের সেই তিন তলার ছোট্ট ছাদে গিয়ে শেষবারের মতো আনন্দ করলাম, কত গল্প, কত ছবি, কত খেলা। সকলে সকলের জন্য প্রার্থণা করলাম,চলার পথ যেন সবার সুগম হয় ।

আনন্দের পর এই বিদায় বেলাতেও সঙ্গে ছিল কলেজ আর আমাদের বাংলা বিভাগের স্যার-ম্যামেরা । ওনারা আমাদের বললেন," চলার পথে এগিয়ে যেতে হলে এরকম অনেক কিছু পিছনে ফেলে যেতে হয়।"

দিনের শেষ মুহূর্তে এসে গোটা কলেজে ছুটে বেরিয়ে কত ছবি তুললাম কলেজের প্রতিটি কোণায় কোণায়। তারপর কলেজের মাঝে ছোট্ট সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে দাঁড়িয়ে কলেজের চারিদিক ঘুরে দেখে সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলাম-" ভুলব না তোদের! এসব কিছু থেকে যাবে মনের স্মৃতিপটে। এই মানকর কলেজকে, আমাদের প্রিয় বাংলা বিভাগকে, স্যার-ম্যামদের ভুলবো না কোনদিন।"

সালটা ২০১৮ আবার একটা ধাপ তৈরি করে উপরে উঠলাম, সাথে না চাইতেও পিছনে ফেলে আসতে হলো কলেজকে, প্রিয় বাংলা বিভাগকে। দিনের শেষে সকলে একসাথে পা রেখেছিলাম কলেজ গেটের বাইরে।

'জীবনের সোনাঝরা দিনগুলি শীতের পাতার মতো ঝরে গিয়েছিল।'

আজ সালটা ২০২৩ কলেজ শেষের পাঁচ বছর পর গর্বের সাথে বলব কলেজ কোন দিন ভুলতে পারিনি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, কলেজও কখনও আমাদেরকে ভুলে যায়নি,আজও কলেজে গেলেই মনে হয় বাড়িতেই আছি। কলেজ প্রাঙ্গণে বন্ধুদের সেই প্রতিশ্রুতি আজও রেখে চলেছি সকলে। যে যার মত এগিয়ে চলেছি কিন্তু আজও একসাথে আছি সময়-অসময়ে। আর এই বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিল আমাদের মানকর কলেজ, আমাদের বাংলা বিভাগ।

আজও চলার পথে বাধা এলে ছুটে যাই কলেজে। আমাদের সেই বাংলা বিভাগের কাছে, আমাদের সেই অভিভাবক স্যার-ম্যামদের কাছে।

সত্যি বলতে পুরোনো ভাবনাগুলো আবারও ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম কলেজ জীবন শেষ হয়তো কলেজের সাথে, বন্ধুদের সাথে, বিভাগের সাথে সম্পর্ক আর থাকবে না। কিন্তু আজ পাঁচ বছর পর গর্বের সাথে বলবো ভাবনা গুলো ভুল ছিল।এই কলেজ,এই বিভাগ কখনও আমাদেরকে ভুলে যায়নি,মা যেমন তার সন্তানের শত দোষ মেনে নিয়েও ভালোবাসে,তেমনই মানকর কলেজ, বাংলা বিভাগ আমাদেরকে কখনও ভুলে যায়নি, আমি ভীষণ আশাবাদী কখনই ভুলে যাবে না।

কলেজ আজ নিজের মতো নতুন রূপে আবার সেজে উঠেছে, বাংলা বিভাগ নতুন হয়েছে, কত নতুন স্যার ম্যামেরা এসেছেন অরিন্দম স্যার, প্রবীর স্যার, প্রতিম স্যার। পুরনো স্যার ম্যামেরা বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু আজও কলেজ সেই ভালোবাসা আমাদের দেয়। বাংলা বিভাগ সেই ভালোবাসা দেয়, নতুন স্যার-ম্যামেরা আমাদের সেই পুরানো ছাত্রের মতনই ভালোবাসে। নিজেকে এখনো সেই পুরনো ছাত্র বলেই মনে হয়। আজও সময়ে-অসময়ে ওনারা পাশে থাকেন। বন্ধুরা আজও খোঁজ নেয়, সময় পেলেই আবার একসাথে আড্ডা গল্প আজও হয়।

বলতে দ্বিধা নেই এই কলেজ এই বাংলা বিভাগ আমার প্রিয় স্যার-ম্যামরা, বন্ধুরা সকলের জন্যই এগিয়ে চলার প্রেরণা পেয়েছি বারবার। তার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ সবার প্রতি।বার বার ফিরে আসবো এই মায়ের ছত্রছায়ায় এই পণ করি আজ,কখনো ভুলবো না মা তোমায়।আসলে মা যেমন সন্তানকে ভুলে যায় না কখনো, তেমনই সুসন্তানও তো মা'কে ভুলতে পারে না। যেন এই মায়ের সুসন্তান হয়েই বেঁচে থাকতে পারি সারা জীবন। ভালোবাসার মানকর কলেজ, ভালোবাসি বাংলা বিভাগ।

স্বৈরিনী

অনুপম সরকার

—বাইরে এখন রাত অনেক। আকাশ গুমোট করে আছে। আত্মার সাথে পরিবেশের যেন একটা সূক্ষ্ম মিল আছে তারা যেন মনের কথাটা ঠিক টের পেয়ে যায়, তা তুমি যতোই লুকিয়ে রাখ কিংবা নিজেকে চার দেয়ালে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করো না কেন। অর্ধেক রাত্রির নিস্তোল অন্ধকারেও চোখ দুটো গোল্লা পাকিয়ে চার দেয়ালে বন্দী ঘরের ছাদের দিকে অনুসন্ধিৎসু হয়ে তাকিয়ে থাকে। বীথিকা শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে তার কীসের এতো দুঃখ, সে যা যা চেয়েছে সবটা ঠিক তাই তাই পেয়েছে অথবা যদি দুঃখও পায় তবে সেটাও তার নিজের পাওনাই ছিল। কার প্রতি তার এতো অভিমান, সে তো কাউকেই চায়নি তার একলা জীবনে। তার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে, সে একা একা রান্নাবাটি খেলেছে, সুন্দর করে সাজিয়ে পুতুলের বিয়ে দিয়েছে। মা তার জন্য অফিস থেকে ফেরার পথে কোনো কোনো দিন পুতুল কিনে আনতো, অনেক রান্নাবাটি, অনেক সাজার জিনিস নিয়ে আসতো। পাশের বাড়ির মণি আসতো খেলতে, পীযুষ আসতো তাদের হাতেপায়ে নোংরা লেগে থাকতো।

মা চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন – ওদের সাথে খেলবি না বীথিকা।

তারপর একদিন ওদের সাফ সাফ জানিয়ে দি আমার সাথে খেলতে আসবি না তোরা। তোদের খেলনা নেই বুঝি?

তারপরও হয়তো পীযুষ আরো কয়েকবার এসেছে কিন্তু ভয়ে কিছুটি বলার সাহস করেনি কোনোদিন। বীথিকার নিয়ম অনুযায়ী খেলা চলেছে। বয়েস বাড়ার সাথে সাথে বীথিকার মনোভাব আরও বিপ্লবী হয়ে উঠেছে। একা থাকার যেন তাকে পেয়ে বসেছে। বেশি বন্ধু বান্ধব কখনোই রাখেনি পার্সোনাল লাইফে। মেয়েরা কেন যে আজকের যুগে এসেও পুরুষদের পায়ের নীচে দমিত হবে এবং সেই মেয়ে মানুষই বা কেমন বেয়াক্কেলে যে পুরুষের কথায় ওঠা বসা করে আনন্দ পায়, বীথিকা এখনো বুঝে উঠতে পারে না। হৃদয়, প্রেম, অনুভূতি এগুলো খুব একটা মাইনে রাখে না তার কাছে। তবে একটা সময় জৈবিক চাহিদার কারণে পুরুষ মানুষের প্রয়োজন হয় বটে কিন্তু তাই বলে স্বামী পরমেশ্বর তার পায়ে মন প্রাণ আত্মা সব বিসর্জন দিয়ে পড়ে থাকতে হবে এ আবার কেমন ভালোবাসা। প্রেম হবে সমানে সমানে তুমি ভালোবাসা দিলে তবেই ভালোবাসা পাবে নচেৎ এক আনাও নয়। প্রেমের কথা মাথায় আসতেই মনে পড়ে কলেজ জীবনের অনেক স্মৃতির মুহূর্ত। সে একটা দিন ছিল যখন ফেমিনিস্ট মনোভাবাপন্ন জীবনের পথে লাফিয়ে বেরিয়েছে সে, যা মন চায় তাই করেছে। নারীবাদী আন্দোলন, নারীদের সমান অধিকার এইসবই ছিল তখন একমাত্র মুখ্য বিষয়, পড়াশোনাও ঠিক করে হয়ে ওঠেনি যার জন্য। প্রেম, হ্যাঁ প্রেম এসেছিল তার জীবনে, ছেলেটি ছিল নেহাতই উজবুক, কত স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল তাকে ঘিরে, নিখুঁত ভালোবাসা ছিল ওর মধ্যে। ক্যাম্পাসে সারাক্ষণ পেছন পেছন ঘুরতো, কয়েকবার একসাথে পার্কে, সিনামা হলেও গেছে একসাথে হাত ধরে।

অধীর আগ্রহ ভরা দুটি চোখ নিয়ে মায়াবী হরিণের মতো বলেছিল সে- কখনো ছেড়ে যাবে না তো? আমি তোমাকে ছাড়া অনেক ভেঙ্গে পড়বো। তুমি পাশে থাকলে বহু দূর এগিয়ে যাব তোমায় নিয়ে। তার কেন জানি না

ওর মনে আমায় নিয়ে একটা সংশয় তৈরি হয়েছিল। আমি বোধহয় তার সাথে থাকবো না বেশি দিন। আর সত্যি তো আমার পথটাও ছিল অন্য আমি তো আর সংসার পেতে স্বামী সেবায় নিয়োজিত হতে চাইনি তখনও। তাই ওকে ছাড়তে হলো, যৌবন বয়েসের বহু স্মৃতি জড়িয়ে ওর সাথে ঠিক তখনই নীলাঞ্জনের সাথে দেখা হলো আমার। অনেক বেশি স্মার্ট, আমার অনেক পছন্দসই ও বটে। একটা বিয়ে বাড়িতে প্রথম দেখা হয় আমাদের। সকাল থেকেই আমার পেছনে লেগেছিল, আমাকে প্রপোজ করেছিল ও। আমি আর দ্বিধা করিনি, আমি আগের সেই আত্মভোলা ছেলেটাকে ছেড়ে দিতে এবারও আর ভাবিনি।

একদিন তাকে ডেকে বললাম সময়টা তখন আর কতোই হবে ওই সন্ধ্যের দিক করে – দেখো আমি জানি না তোমায় বলা ঠিক হবে কি না, তবে মনে হলো তোমাকে সত্যি বলাটাই ঠিক। আমি একজনকে ভালোবাসি তুমি আমাকে পারলে ভুলে যেও। তখন আমার বয়েস কম হলেও ভালোবাসা যে কত গভীর ক্ষত দিতে পারে তা আমার অজানা নয়। তবে আমি আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেছি এতে অন্যায় টা কীসের? শুধু শুধু আবেগে তাড়িত হয়ে একটা বেকার ছেলের হাত ধরে সারাটা জীবন নষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তাতেও যখন সে ছাড়তে রাজি হয়নি তখন বাড়ির অজুহাত দিয়ে বলেছিলাম— বাবা মা আমাদের সম্পর্কটা জেনে গেছে, আমি যদি তোমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাই তবে তারা আত্মহত্যা করবে বলেছেন। কথাটা রুঢ় শোনালেও এই অজুহাত দিতে আমি বেশ প্রসিদ্ধ ছিলাম এবং এর কার্যকারীতা সম্বন্ধেও আমি সুনিশ্চিত ছিলাম। ছেলেটা হয়তো সবটাই বুঝলো আবার হয়তো কিছুই বুঝলো না, শুধু একটা মায়াবী মর্মস্পর্শী বাকা হাসি হেসে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলো। কিছুদিন বাদে একটা মর্মভেদী সংবাদ পেলাম, খবরটা শুনে মায়া ও লাগলো কিন্তু আমার আত্মাভিমান সাংঘাতিক, কিছুতেই কিছু হলো না। তবে শেষ পর্যন্ত বিয়ে আমার নীলাঞ্জনের সাথেও হয়নি। সে বড়োলোকের ছেলে কেবল আমাকে ব্যবহারই করেছে। তাদের মতো ছেলের কাছে আমার মতো দু-একটা গালফ্রেন্ড থাকা অস্বাভাবিক কিছু ব্যাপার নয়।

আমার কপালটা চিরকালই ছিল লাকি, অর্থাৎ তাকে বলে সোনায় সোহাগা। নাহলে এতো কিছুর পড়েও আমার জীবনে কীভাবে এতো সহজ-সরল, সাদাসিধে বর এসে জোটে বুঝি না। কখনো কখনো মনে হয় হয়তো ঈশ্বর বলে কিছু নেই, কিংবা কর্মফল ভোগ বলেও কিছু নেই। নইলে কিছু একটা শাস্তি তো আমার পাওনা থাকতোই। যদিবা আমার এই সংকীর্ণ জীবনে কখনো একমুহূর্তের জন্যও শান্তি আমি পাইনি। কোনো মেলা-খেলা, বিয়েবাড়ি, অনুষ্ঠান এমনকি কোনো পুরুষের ছোঁয়াতেও কোনোদিন সেই অনুভূতি সেই আনন্দ পাইনি। আমার বিয়ে হয়েছিল শোভন তালুকদার নামে এক যুবকের সাথে। সে স্কুল মাস্টারি চাকরি করে। প্রতিরাতে যখনই তাকে স্নেহের বশে মাথায় আলতো করে হাত বোলাতে বোলাতে আমার অতীত জীবনের কথা বলতাম সে আমার কথা শুনে বড্ডো আঘাত পেতো, আর প্রতিদিনই প্রায় বলতো- তোমার অতীত জীবনকে নয় সব ভুলে আমি আজকের তুমিটাকে ভালোবাসি। আমার সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো? কথা দাও। কতক বার স্নেহবশে আমিও কথা দিয়েছি মাথার চুলে আলতো করে আঙ্গুল বুলিয়ে দিতে দিতে। তবে কথা রাখা হয়ে ওঠেনি।

আমাদের একটা সন্তানও হয়েছিল, নীলাদ্রি। সেও আমাকে বড্ডো ভালোবাসাতো কিন্তু তখন আমি বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, সময় দেওয়ার মতো অবসর হয়ে ওঠেনি কখনো ঠিক করে। আমি একটা ওম্যানস ক্লাবের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম, আমাদের কী সংসারের মায়া থাকলে চলে? আমাদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই সহজ নারী জাগৃতি, নারীবাদী ফেমিনিস্ট করে তোলা সকল নিপীড়িত মহিলাদের। আর কতদিন পুরুষের দয়ায় চলবো এবার আমাদের কিছু একটা করতেই হবে, এক্ষেত্রে বলা ভালো কিছু স্বার্থান্বেষী, স্বৈরাচারী পুরুষও কু-মতলবে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। কত নারীর যে ঘর ভেঙেছে তার ইয়াত্তা নেই, নারীর ঔদ্ধত্য পুরুষ কোনো কালেই মেনে নেয়নি। আজ হয়তো তারাই আমায় এই এক আকাশ নক্ষত্র ভরা অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অভিশাপ দেয়, হয়তো তাই এই জ্বালা, প্রতিরাতে ততই চোখে ঘুম হারা। আমার স্বামীকে যত জ্বালিয়েছি সে আমার কাছে এসেছে, ধরা দিয়েছে আর আমি হয়েছি বিজয়িনী গর্বে আত্মহারা । এমনি আঁধার রাতে বদ্ধ ঘরে প্রেম হারা হয়ে আমার পায়ে আছাড় খেয়ে বলেছে— এমন করো না লাবণ্য, আমি তো তোমায় সবটা দিয়েছি, তোমার কোনো কিছুতেই আপত্তি করিনি। তারপরও যদি কিছু বাকি থাকে তবে জানাও কী চাও তুমি? সব কিছু দিতে রাজি আছি আমি একবার শুধু মুখ ফুটে বলো।

কিন্তু আমার নির্দয় শরীর তার এই করুন অবস্থা দেখে হাসি এসেছে দু-গাল ভরে। তার প্রতি সম্ভ্রম রাখতে পারিনি কিছুতেই। পুরুষের এই অবনত মস্তক আমার সহ্য হয় না কোনোকালেই তাই তাড়াতাড়ি উঠে বললাম- আগে পা ছাড়, কী চাই শুনবে ? আচ্ছা বেশ বলছি –আমি ডিভোর্স চাই! কারণ এতোদিন তোমার সাথে ঘর করে এইটুকু বুঝেছি আমি তোমার জীবনে থাকলে তোমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। তারচেয়ে বরং তুমি পুরুষ মানুষ আর একটা বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার করো। শোভন পা দুটো আরো একটু কষে জড়িয়ে ধরে, হৃদয় নিংড়ানো সবটুকু আশ্বাস ঝেড়ে ফেলে বলেছে— লাবণ্য আমি পারবো না তোমায় ছাড়তে, প্লিজ বোঝার চেষ্টা করো। বিশ্বাস করো খুব ভালোবেসে ফেলেছি। আমার কথা না ভাবো, অন্তত পক্ষে আমাদের মেয়ে নীলাদ্রির কথা তো ভাব একবার। সকাল থেকে কিছু খায়নি কেবল মা মা করে চলেছে। ওর মনের মধ্যে কী ঝড় বইছে ভাবো তো একবার, বলতে পারো ওইটুকু মেয়ে কোন দোষের শাস্তি পাচ্ছে? প্লিজ লাবণ্য তুমি এমনটা করো না। একটু শান্তিতে থাকতে দাও আমাকে দেখবে আমরা দুজনেই অনেক সুখী হবো। পুরুষ মানুষের ধৈর্য্য দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। এতো সহ্য কী কেবল একটা সুন্দর সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্যই হতে পারে? কিন্তু নাহ্ তখন আমার মাথা ভূত চেপেছে এর শেষটা দেখার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। শোভন আমাকে ভালোবেসে লাবণ্য বলে ডাকে যদিও আমি ওকে কিছুই ডাকি না।

আমি স্থির নীচু স্বরে বললাম— মেয়ে আর কী ভাববে। ভাববে আমার মা একজন স্বৈরিনী মহিলা আর বাবা মহাপুরুষ। আর হ্যাঁ আমি তো তোমাকে বলেছি আমি নিজেই নষ্ট হতে চাই তার জন্যই আমি খারাপ সকলের চোখে। এরপর শোভনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙলো, শোভন আজ স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। তারকাছে চেনা মুখটা বড্ডো বেশি অচেনা মনে হতে লাগলো । হঠাৎ করেই এতোটা দূরত্ব কখন যে হলো শোভন টের পায় না। তার প্রাণ প্রিয় লাবণ্য আজ এ কী কথা বলছে সবটা যেন গুলিয়ে ওঠে তার কাছে, একটা সময় ছিল যখন বই খাতায় মোড়ানো বিদ্যা- বুদ্ধি, পান্ডিত্যে ঠাসা একটা আলাদা জগত ছিল তার কাছে দুচোখে স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল। বাইরের

এই স্বার্থপর জগৎ টা কখনোই তাকে খুব একটা বিব্রত করতে পারেনি, তাই বাইরে চলার নিয়মটাও সে ভুলে গেছে। এ সমাজে চলতে গেলে যে অতিরিক্ত ভদ্র সহৃদয় হওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো অন্যায় তা সে ভুলে গিয়েছিল। অন্ধকারেও বেশ বোঝা গেলো শোভনের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠেছে।

মুখ থেকে শুধু গোঙানির মতো একটাই শব্দ বেরিয়ে এলো তার – ছিঃ লাবণ্য। তারপর আর একমুহূর্তেও নয় সোজা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে শোভন, আর কখনো ফিরে আসেনি সে। আমার শাশুড়ি তো আমাকে যারপরনাই গালগাল দেয় উঠতে বসতে, বলেন— রাক্ষসী বিয়ের দিন থেকেই আমার ছেলেটাকে খেয়েছে কিন্তু পাপাত্মার পিপাসা মেটেনি। ভেবেছিলাম সন্তান হলে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু তাও হল না এখন তো আরও বাড়বেড়েছে, আমার সাধের নাতনি টাকে রাখলে হয়। আসলে কথাটা সত্যি মেয়েদের জন্যই মেয়েরা আজ পিছিয়ে। শাশুড়ি তো নিজেও একজন মহিলা, মরতে বসেছে এখনো মাথায় ঢুকলো না যে মেয়েরা কেবল সন্তান উৎপাদন আর লালন পালন করার জন্য নয়, সংসারের ঠ্যালা কেবল তাদের একলাই বইতে হবে কেন? বাইরে মেঘ গর্জে উঠলো। থমথমে আকাশ ফুঁড়ে এবার কয়েকফোঁটা অশ্রু মতো ঝোড়ে পড়লো।

কিন্তু বেইমান গ্রীষ্মের তপ্ত মাটি কিছুতেই তার চিহ্ন কী আর ইতিহাস গড়ে রেখে দেবে সাজিয়ে ? জল গড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই মাটিতে মিশে উধাও হয়ে গেল। এখন সব নিশ্চিন্ত আবারও বৃষ্টি ঝড়লো। পোড়া চোখের কোণে ঠিক মতো জলও আস্তে চায় না। বীথিকা ভাবতে থাকে এতো নিষ্ঠুরতা, এতো পাপ সব যদি এতো সহজেই ঝড়ে যায় তবে এতো মানুষের অভিশাপের তো আর দাম থাকে না। আমায় তো পুড়তে হবেই, পুড়ে পুড়ে শেষ হতে হবে। শেষ না হলে নতুন করে শুরু হবার প্রশ্নই ওঠে না আর। আজ সকালের একটা মজার ঘটনা বলি, প্রায় একমাস আমার শোভনের সাথে কোনো দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। কয়েকবার নীলাদ্রির অজস্র ক্ষোভ আর জেদের আওয়াজ পেয়েছি বাইরে থেকে একটা মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা বাচ্চা মেয়ে কিন্তু আমার বধির আমার কান তখনও মাতৃসত্ত্বা জেগে ওঠেনি।

মনে হয়নি দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমু খেয়ে বলি— মা তুই আমারই সন্তান রে তোমার মা একটুও ভালো নয়, পচা একটা, কেবলই কষ্ট দেয় তোমায়, তুমি আমার কাছে এসো আগলে রাখি বুক দিয়ে। কিন্তু কী যে বলবো কীসের যে আমার এতো অভিমান! নাকি আমি পাগল হয়ে গেছি বুঝে উঠতে পারি না। মনে হলো, নাহ ওকেও পলে পলে দগ্ধ হয়ে শিখতে হবে, এ সমাজে চলতে হলে নিষ্ঠুরতা প্রয়োজন। আমার হৃদয় পাষাণ হয়ে এই ঘুমহীন কালি পড়া চোখ দুটো জ্বলে মরবে আর তুমি মায়ের আদর পেয়ে শান্ত হবে তা কখনো সম্ভব নয়। আমি জ্বলবো আর আমার আসে পাশে, পরিচিত অপরিচিত সবাই জ্বলবে। হ্যাঁ এতেই আমি সবচেয়ে বেশি সুখী হই।

আজ সকালেই ঘুম থেকে উঠে দরজার নীচে একটা চিঠি পেলাম, কোর্টের চিঠি। শোভন আমার মান রেখেছে আমার থেকে ছাড়া পেতে ডিভোর্স আপিল করেছে। শোভন আজ সত্যি সত্যি ডিভোর্স চেয়েছে। আমার তো খুব খুশি হওয়ার কথা কিন্তু কই খুশি হতে পারছি কই? আমি এতোদিন যা চেয়েছি মুক্তি ঠিক তেমনটাই পেয়েছি। সে ভুলে গেছে তার প্রিয় লাবণ্য কে, হ্যাঁ সেও এখন নিশ্চিন্ত, আর কষ্ট পায় না সে আমায় নিয়ে। একবার মনে হলো তাকে যদি জোর গলায় বলতে পারতাম –তোমার লাবণ্য ভালো নেই.. তুমি কি শুনতে পাচ্ছো আমার

কথা তোমার লাবণ্য ভালো নেই, কিন্তু ডাকি কী নামে সে তার প্রিয় বীথিকাকে নাম দিয়েছে তো ভালোবেসে লাবণ্য কিন্তু আমি তো কখনো তার কোনো বেসরকারি নাম রাখিনি। ঘর আবার নিস্তব্ধ হলো, এবার বাইরে ঘরে দুদিকেই নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেলো। সব কিছু শূন্য আর অসার হয়ে পড়ে রয়েছে। আর চিন্তা নেই তাকে কিছু একটা করতেই হবে।

বাইরে বেশ কিছুক্ষণ থেকে একটা ঘর্ষণ জনিত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কী সেই আওয়াজ পাগল করা দুর্দান্ত আকর্ষণ। ঘূর্ণির অতলে গভীর খাই, কী ভীষণ বীভৎস উল্লাস। নদীতে বান ডেকেছে, ভরা নদী একূল ওকূল, মাঝে বীভৎস জলের প্রলয় উল্লাস, সীমাহীন আনন্দে ছুটে চলে নদী সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে। ক্ষণে ক্ষণে পাড় ভেঙ্গে পড়ছে বিকট শব্দ করে। এতো স্বাধীনতা এতো অবাধ আনন্দের মাঝে আমি একা ঘরে আবদ্ধ ভাবতে লাগলো বীথিকা। তাড়াতাড়ি একটা শাল মুড়ি দিয়ে বিছানা ত্যাগ করে উঠে পড়লো সে। তারপর আস্তে করে দরজাটা খুলে বেড়িয়ে এলো বাইরে। কিছুদূর হাঁটা পথেই সামনে নদী দেখা যায়। কয়েকটি পরপর তালগাছের সারি মাথা উঁচিয়ে আছে। নদীর জল এ অন্ধকারেও বেশ বোঝা গেলো কালো হয়ে ঘূর্ণিপাকের তালে তালে ইশারায় হাতছানি দিয়ে ডেকে চলে দুর্বার আকর্ষণে।

বীথিকা একবার মাত্র ভেবে নিয়ে ছুটে চললো নদীর দিকে। তার শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত বেগে ওঠাপড়া করতে লাগলো, সে কিছু জানে না কিছু ভাবতে পারছে না, আজ তাকে চিরশান্তির অতলে গাঁ ভাসিয়ে দিতেই হবে। আর এ ভীষণ যন্ত্রণা দগ্ধ জ্বালা সহ্য হয় না। সে তার সারাজীবনের বিফল প্রচেষ্টায় তন্য তন্য করে অনুসন্ধান করেও একাবারের জন্যেও তার প্রিয় অভিপ্রেত মানুষটির দেখা পায়নি যে তাকে আশ্বাস গিয়ে দেবে। যার বুকে মাথা রেখে সে সমস্ত ভুলে নিশ্চিন্ত হবে। না আর ভাবনা নয় এবার সে নদীর জলে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে ক্ষমাহীন উল্লাসের সাথে মনের যন্ত্রণা মেটাবে। একবার মনে মনে বীথিকা নিজের অজান্তেই আউড়ে নিল-জীবন যৌবন সব তোমায় উৎসর্গ করলাম হে প্রিয়তম...।

সামনেই বিরাট দুকূল ভরা নদী, বিভৎস তার স্রোত ক্ষিপ্র বেগে ধেয়ে চলেছে সমস্ত কিছু ভাসিয়ে নিয়ে। আকাশ এখনো অন্ধকার, কয়েকটি তারা এখনো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হঠাৎই বীথিকা তার হাতে একটা আলতো চাপ অনুভব করলো। অন্ধকারের মধ্যেই আগন্তুক বলে উঠলো- বিনা নিমন্ত্রণেই চলে যাচ্ছ লাবণ্য?

কথাটা এলো যেন বীথিকার সুষুম্নকান্ড ভেদ করে অন্তরের অন্তত গহীন প্রদেশ থেকে। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ, বিথীকা ঘুরে দাঁড়ালো। একটা প্রচন্ড বজ্রাঘাতের ন্যায় চড় এসে পড়লো গালে।

গালে হাত বুলাতে বুলাতে যোগিনীর মতো উম্মাদ হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে বীথিকা আর্তনাদ করে উঠলো – আমার নীলাদ্রি, আমার নীলাদ্রি কোথায় ? আজ হঠাৎ বীথিকার প্রাণ পুড়ে উঠলো, চোখের সামনে তার নিজের অন্তত ঘৃণ্য আচরণ গুলো ফুটে উঠতে নিজেই লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হলো। সে পেয়েছে এতোদিনে সেই বজ্রকঠিন হাত যে হাতের স্পর্শের জন্য এতোকাল প্রতিক্ষা করেছে। চোখ থেকে অঝরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো, বীথিকা আর মুছে ফেললো না এবার।

আমার প্রিয় কলেজ

মানসী কুন্ডু

সালটা ছিল ২০১৭, বাইশে জুন। যেদিন শিক্ষার্থী হিসেবে কলেজে প্রথম পা রাখলাম সেদিনই অনুভব করলাম আমার সোনালি কৈশোরের ইতি হলো আজ। স্কুল জীবনের গুন্ডি পেরিয়ে কলেজের গুন্ডি–এ যেন হঠাৎ বড় হয়ে যাওয়া।

বর্ধমানের বুকে মানকর নামক স্টেশন থেকে রাঙামাটির পথে বেশ কিছুদূর গেলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্গত আমাদের নাতি দীর্ঘ কলেজ-মানকর কলেজ। বর্তমানে যদিও সেটি নাতি দীর্ঘ নয়। প্রকৃতি এখানে উদার হাতে ঢেলে দিয়েছে তার অফুরন্ত সৌন্দর্য। আর অন্য সব দিক দিয়ে কলেজটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শহরের বাইরে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে যে কোন দুর্নীতির কলুষমুক্ত থেকে উন্নত শিক্ষা বিতরণ এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। কলেজের পিছনে পাহাড়ের সারি মত অসংখ্য গাছপালা। খুব সহজেই যে কারো নজর কেড়ে নেয়। চারিদিক শুধু সবুজ আর সবুজ। সেই সাথে পাখির কূজন। মনে হতো, এটা অন্য কোন পৃথিবী। শীতকালে ক্লাস করতে করতে বিকেল গড়িয়ে গেলে সূর্য হারিয়ে যেত গাছের আড়ালে। আর শেষ বিকেলের 'কনে দেখা আলো' অপরূপ মায়াজাল তৈরী করত। আমরা গভীর বিস্ময়ে এই পার্থিব সৌন্দর্য উপভোগ করতাম। কলেজের প্রথম দিনটির কথা খুব মনে পড়ে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকেই এর জন্যে প্রতীক্ষা। একের পর এক আবিষ্কার। প্রথমেই দেখা গেল, একটি ক্লাসরুমে সব বিষয়ের ক্লাস হয় না। কলেজে যেদিন প্রথম ক্লাস করতে গেলাম প্রথম ক্লাসটি ছিল বাংলার তুর্কি আক্রমণ পড়িয়ে ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় লিপি ম্যাম। প্রথম দিন ক্লাসে একটু বেশি আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল বাংলা বিষয়ের প্রতি। আস্তে আস্তে বেড়ে চলল বাংলার বিষয়ের প্রতি এক নাড়ীর টান। আস্তে আস্তে পরিচয় হলো বাংলা বিভাগের অন্যান্য দের সাথে। সবার সাথে যেন গড়ে উঠল এক অন্যরকম সম্পর্ক, এটা শুধুমাত্র শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্ক না, গড়ে উঠেছিল একজন দাদা ভাই সম্পর্ক, একজন দাদা বোনের সম্পর্ক, আবার গড়ে উঠেছিল একজন বাবা মেয়ের সম্পর্ক, একজন মা মেয়ের সম্পর্ক, এখানে খুঁজে পেয়েছিলাম একটা নতুন পরিবার। এই ভাবে সংসারটি চললো আমাদের ২০১৯ পর্যন্ত তারপরে এক ভয়ানক মহামারির

জন্য সংসারটি আমাদের ভেঙ্গে গিয়েও ভেঙে গেল না কারণ সেই সময় শিক্ষাব্যবস্থার এক বিকল্প পথ তৈরী হয়েছিল। যেখানে আমরা হয়তো সাক্ষাৎ ছাড়াই সংসার গড়ে উঠেছিল অনলাইনে। কলেজের শেষ সময়টি আমরা সবাইকে পাইনি একসাথে। এই কলেজে আমি শিখেছি অনেক কিছু। হ্যাঁ, আমি একজন বাংলা বিভাগের ছাত্রী তার সাথে একজন এনসিসি ছাত্রী, এই এনসিসি করতে গিয়েও আমি জীবনে অনেক কিছু শিখেছি সাহস, জীবনে এগিয়ে চলা পথ। এই এনসিসি করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করেছি ক্যাম্পে জয়ী হয়েও এসেছি। এ ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা এক অদ্ভুতপূর্ণ সে এক অন্যরকম অনুভূতি। কলেজের বিভিন্ন প্রোগ্রামেও আমি অনেকবার অংশগ্রহণ করেছি। আমি ছোট থেকেই আলপনা দিতে খুব ভালোবাসি কিন্তু কলেজে সেভাবে কোনদিন অংশগ্রহণ করিনি, আলপনা প্রতিযোগিতায় একবার ইচ্ছে করেই অংশগ্রহণ করেছিলাম আলপনা প্রতিযোগিতায় জানিনা কিভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম সেই অনুভূতিটাও আমার কাছে চির স্মরণীয়। বাংলা বিভাগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নামিদামি মানুষেরা এসেছে তাদের সাথে ফ্রেমবন্দ ছবিগুলি আমার কাছে এক একটা জীবনের পাঠ।

রহস্যময় মস্তিষ্ক অনেক তুচ্ছ স্মৃতিই ধারণ করে রেখেছে, হয়ত বা হারিয়ে গেছে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু। একটা কথা আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে স্থায়ী বন্ধুত্বগুলো গড়ে ওঠে কলেজে।

আমাদের কলেজের সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই ছিল। শহর থেকে অনেক দূরে হওয়ায় শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত সমস্যা ছিল। এই কলেজ দিয়েছে আমাকে আমার অনেক অপূর্ণতা পূর্ণ করে। দাদা, ভাই, দিদি, খামতি পূর্ণ করে দিয়েছে। যাদের হয়তো আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। যাদের হয়তো আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। বর্তমান সময়েও তারা আমার ইচ্ছে গুলি আবদার গুলি পূর্ণ করে চলেছে। যাদের কাছে অনায়াসে আবদার করতে পারি। এই ভাবে অনেক কিছু স্মৃতি গেঁথে রয়েছে মস্তিষ্কে।

কলেজের স্মৃতিগুলি বলতে গেলে হয়তো হয়ে যাবে এক কাব্যগ্রন্থ।

পুরানো সেই দিনের কথা

শ্বেতা দে

সে এক দিন ছিল আমাদের। সময়গুলো বড্ডো তাড়াহুড়ো করে চলে যেতে থাকে। রেখে যায় শুধু টুকরো টুকরো মুহূর্তের সামিয়ানা। পরিবার অর্থাৎ মানকর কলেজ। হ্যাঁ সমগ্র কলেজ জুরে অসংখ্য মুহূর্ত যেন রয়ে গেছে যেন মনের কোনে, থাকারই তো কথা। তিনটি বছর যেন হুস করে পেরিয়ে গেছে বুঝে উঠিনি। প্রথমদিনের কিছুটা ভয়, কিছুটা চিন্তা আর অনেকটা উৎসাহী পূর্ণ মন নিয়ে বেশ ভালো লাগার দিন ছিল। চেনা কয়েকজনের দাদা দিদি , বন্ধুদের ভিড়ের মধ্যে অচেনাদের ও আপন করে নেওয়ার মধ্যে যেন অন্যরকম ভালোলাগা থাকত। আমাদের এই পরিবারের ছিল সব্বাইকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে এসেও যেন কোথাও মনে হতে দেয়নি সত্তিই একা। প্রতিটি বিভাগীয় স্যার ম্যামদের , বন্ধুবান্ধবদের সান্নিধ্য পাওয়া, অনুষ্ঠানে তাঁদের থেকে উৎসাহিত পাওয়া ,সিনিয়র দাদা দিদিদের ভালোবাসা, কোনো বিষয়ে সাহায্য , কিছু ভুল হলে সেটার সংশোধন করা সবমিলিয়ে বড়োই কাছের সবকিছু। আর হ্যাঁ Nss আমাদের দাদা দিদি- ভাইবোনদের সাথে এক মেলবন্ধন করে দিয়েছিল।২০১৭-২০২০ এই তিনবছরের যখন শেষবেলায় ছেড়ে আসার পালা সেসময়েও মহামারী যেন আরো সব্বাইকে এক হতে না দেওয়ার আক্ষেপ থেকে গেছে। তবুও এই পরিবার আত্মনে , মননে রয়ে গেছে স্মৃতির পাতা জুড়ে। শুধু নেই নিয়মিত দলবেঁধে আসা যাওয়ার ও তার মাঝের গল্প । পুরোনোর মধ্যেও নতুনত্বের রসদ যখন স্মৃতিরোমন্থনের মধ্যে দিয়ে পেতে পেতে ভাবিয়ে তোলে আবার যদি ফিরে যাওয়া যেত সেই প্রাণোচ্ছল দিনগুলিতে !

বসন্ত শেষে

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য্য

বসন্তের শেষ চৈত্রে
গোধূলির কোকিল কাতর বিরহে।
পরিযায়ী মন ধ্বনি তোলে কুহুকুহু,
অজানা পিছুটান শেষ থেকে চায় শুরু।
সূর্য ডোবার পালা শেষে আঁধার আসবে ঘিরে,
একলা আকাশ কবিতা পাঠায় প্রেমিক চাঁদের ঘরে।
চেনা শহর হাতছানি দেয় নতুন ভোরের স্বপ্ন।
আলগা হাওয়ায় ঝড়ে পরে কিছু বেল ফুলের ছন্দ।
শাখার আগায় কিশলয় পরিণতির অন্দে,

প্রান্তর মাঝে কান্তার মন নিবিড় অনুসঙ্গে।
রঙীন পটে তুলির টানে আঁকিবুকি কাটি স্বল্প,
লালচে আভায় রচিত হয়; অরুণ আলোর গল্প।

কাঁচের স্বপ্ন

সুরজিৎ গোস্বামী

চোখের কোনে স্বপ্নটা ক্রমশ বড় হতে লাগলো
পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে দেখলাম
কয়েক টা দশটাকা আর কিছু খুচরো পয়সার সম্মনয়
তবু স্বপ্নটা যেনো পিছু ছাড়তে চাইলনা
মানিব্যাগটা পকেটে ঢুকিয়ে
আবার উঠে দাড়ালাম
কিন্তু তখনই দর্শন হলো কিছু উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে
যারা সামনের সারিতে ভির করে দাঁড়িয়ে আছে
এক গুচ্ছ ব্যাংকের বই নিয়ে
স্বপ্ন কিনবে বলে
তবু যেনো আমি থামলাম না
ক্রমশ পা বাড়ালাম সেই স্বপ্নের দিকে
কিন্তু পাশ থেকে একটা হতাশিত স্বর
বিরক্তি সুরে বেজে উঠলো,
"আর কতদিন টানবো বাবা"
সেই শব্দ আমাকে জব্দ করে দিলো।
কানের ভিতর ঢুকে
চোখের মধ্যে জমে থাকা
কাঁচের স্বপ্নটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল।
যা কোনদিনো আর জোড়া লাগার নয়।

অন্তহীন

চঞ্চল ভট্টাচার্য

যতদূর জানি,আমার জানা হয়নি এখনও কিছুই!
আমার মাঝেমধ্যে মনে হয় হৃদয়ের গভীরতার অভাব বোধহয় আর কখনও পূরণ হবে না।
পূরণ হয় না বোধহয়!

জীবনে অনেকগুলো যুদ্ধ পেরিয়ে তবেই তো একটা মানুষ 'মানুষ' হয়।
যদি 'যুদ্ধ' মানে ধরে নিই 'জীবন',তবে 'মৃত্যু'কে কী নাম দেওয়া যায়?
জানা নেই আমার।
জানা থাকে না বোধহয়!

এই পৃথিবীর সবচেয়ে '*শ্রেষ্ঠ*' মানুষ যদি খুঁজতে যাওয়া হয় মহাসমারোহে,তবে হয়রান হতে হয় অযথা।
বাবাকে,ঋণ নিয়ে আমার পরীক্ষার ফিজ মেটাতে দেখেছি আমি।
মা আমাকে সবসময় বড় মাছ কিম্বা বেশিটাই কেন যে দেয়...
শ্রেষ্ঠ মানুষ বাইরে কেন খুঁজবো আমরা?
যাঁরা আমাদের মধ্যেই রয়েছেন সর্বক্ষণ,তাঁদের বাইরে খুঁজতে যাওয়াটা বোকামি...

হয়তো এভাবেই,জানার ইচ্ছে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে শ্রেষ্ঠত্বের পথে।
হৃদয়ের গভীরতার অভাব পূরণ করার চাহিদা আমাকে বুড়ো করে তুলবে,চুলে পাক ধরবে হয়তো একদিন।
হয়তো আমিও 'বাবা' হয়ে যাবো কোনো দিন!
কিন্তু...
'শ্রেষ্ঠ' মানুষ হয়ে উঠতে পারবো কী কখনো?
শ্রেষ্ঠ বাবাদের মতো!
এইসব জিজ্ঞাসারা আমাকে অস্থির করে তোলে সর্বদা।
উত্তরেরা ফাঁকি দেয় আমাকে,
নাকি আমিই ওদের ফাঁকি দিতে চাই!
জানি না...
যতদূর জানি,আমার জানা হয়নি এখনও কিছুই!

মানকর কলেজ

মৌসুমী বেজ
বাংলা বিভাগ (২০১৮-২০২১)

পুরানো সেই স্মৃতির ভাঁজে
থেকে যাবে এই দিনটি।
পড়লে মনে পুরোনো কথা
ভারাক্রান্ত হয় মনটি।।
কলেজের সেই দিনগুলো
আজও যেন ভীষণ রঙিন
মুহূর্ত গুলো ছোটো ছোটো
কিন্তু অনেক অনেক দামী
বন্ধু তোমায় চিনতে শেখা
কলেজের সেই চার দেওয়ালে
আঁটকে থাকতো বছরটা পুরো
ইন্টারনাল আর সেমিস্টারে।।
বাংলা বিভাগ সবার প্রিয়
যার হয়না তুলনা।
কবিতা হোক বা নাচ-গান
বাংলা বিভাগ তুমি
আজও আমাদের প্রাণ।।
আড্ডাবাজিও চলত বেশ
কলেজ ক্যান্টিন কিংবা ক্যাম্পাসে।।
সেই সুন্দর স্মৃতির জন্মস্থান
আমার ভালোবাসার এই প্রতিষ্ঠানে।।

প্রিয় মানকর কলেজ

শিবরাম হাঁসদা

প্রিয় মানকর কলেজ,দীর্ঘ সময়ের স্মৃতি,
প্রিয় বাংলা বিভাগ, ছন্দময় এক গীতি।

প্রিয় সাহিত্য বাংলা পড়ে শিখেছি বাস্তবতা।
ভালোবাসা আছে হৃদয় জুড়ে,স্মৃতিদের কথকতা।

উপন্যাস আর কবিতার মাঝে
পেয়েছি শিক্ষা,জীবনের জয়গান।
সাহিত্যকে করেছি সঙ্গী, পেয়েছি নূতন জীবন এবং উচ্ছ্বসিত প্রাণ।

অরিজিৎ স্যার ভীষণ ভালো
বাংলা বিভাগে আশার আলো,
পথ দেখাচ্ছেন জীবনের পথে পথে।
কাজল বাবুও শিখিয়েছিলেন,
মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে হবে জীবনের জয়রথে।

মেহের বাবুও শিখিয়েছিলেন সাহিত্যটা পড়তে হবে,মন থেকে রোজ স্বাধীন হয়ে তবেই।
বনশ্রী ম্যাম উৎসাহ দেন 'পড়তে থাকো,জীবনে সফল হবেই।'

লিপি ম্যামের কথা কী আর বলতে পারি আমি।
তাঁকে দেখেই শ্রদ্ধা জাগে, তিনি অনেক দামী।

কলেজে তখন শেষ মুহূর্ত,আমরা সবাই অনার্স শেষের গুনছি দিন।
অধ্যক্ষ সুকান্ত স্যার, কলেজটাকে সাজিয়ে দিলেন, চতুর্দিকই নব-নবীন।

কলেজ শেষে নতুন করে নতুন পরিচয়
নতুন নতুন স্যার ম্যামরাও কাছের মনে হয়।
তাঁরাও ভীষণ কাছের হয়েই কাছেই থাকে সর্বদা।
এই কারণে কলেজ শেষেও, শেষ হয়নি পর্বটা।

প্রিয় মানকর কলেজ, প্রিয় বাংলা বিভাগ।
মনের মাঝে মাতৃসম, মন্দির হয়েই থাক।

যুদ্ধ অভিসার

শেষাদ্রী চ্যাটার্জী

যুগ যুগ ধরে চলে আসছে সেই একই রীতি,
নেই কোনো শান্তির উদভাবন।
বেজে চলেছে মৌলিক যাতায়াতের সাইরেন,
কিন্তু নেই কোথাও চিরমুক্তি।
মানুষের মন ভয়ের আতঙ্কে জর্জরিত,
যুদ্ধের দামামা অতিষ্ট করে তুলেছে তাদের জীবন।
এমন অরাজকতায় প্রকৃতিও নিরুপায়,
দুর্ভিক্ষ, ক্ষরা, অনাহার আর হাহাকারে আকাশ থেকে পাতাল সুনসান।
আত্মহত্যা, ক্ষুদা, প্রাণত্যাগ ও দেহত্যাগের জ্বালায়,
চারিদিক হয়ে উঠেছে শ্মশানের চিতাভস্ম।
নির্জীব ধরার বুকে নেই কোনো প্রাণ,
ক্রমশ হয়ে উঠেছে প্রখর থেকে প্রখরতর।
তাই যখন সবাই দিশাহীন,
ঠিক তখনই আবির্ভাব হয় দেশমাতৃকার সন্তানদের।
মনে আছে সেই শহীদ ক্ষুদিরামের কথা?
যিনি আপন প্রাণ মূল্যহীন করে বিলিয়েছেন অমুল্যদের।
ফাঁসির রশিটা বিজয়মাল্য করে টেনেছেন নিজের গলায়,
আনন্দের সুরে বলেছন "বন্দে মাতরম"।
মনে পড়ে আমাদের নেতাজির কথা?
যিনি গর্ভজ মা কে ভুলে;
আপন করেছেন দেশমাতাকে,
এই মহান ত্যাগ যুব সম্প্রদায়ের মূল বীজমন্ত্র।
মনে পড়ে সেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কথা?
নিরন্তর পরিচালনার মাধ্যমে যিনি জ্বালিয়ে তুলেছিলেন;
স্বাধীনতা বিজয়ের পঞ্চপ্রদীপ,
দুর্বলকে দিয়েছিলেন সবলের বাণী।
এছাড়াও মনে পড়ে গান্ধিবুড়ি, বিনয়-বাদল-দীনেশের আর সূর্য সেনের কথা?
মনে পড়ে সেই দেবী চৌধুরানীর কথা?
সামান্য কুলবধূ থেকে দেশনায়িকাতে রূপান্তর;
অজানাকে জনার পথে অগ্রসরের নীতি,
সাধারণ কন্যা থেকে মাতা হয়ে ওঠার কাহিনি।

ক্ষণিকের স্মৃতি

অমিত লোহার

ক্ষণিকের স্মৃতি প্রতিক্ষণে ক্ষণে না হলেও,
প্রতিদিন হয়তো মনে পরবে তোদেরও।
যখন তোরা থাকবি না নিজের পরিচয়ে,
অন্যের বিবেকের আদরেও।।
তোদের হাসিতেই হেসেছিলাম
হয়তো তোদের হাসিই থাকবে।
হয়তো তখন মরিচ পরিবে
পুরানো দিনের পুরাতন হাসির খোরাকে।।
হয়তো আর হবে না কখনো দেখা
তখন হবো সঙ্গ হারা একা।
আর কখনো পাবো না আমি
তোদের মতো সঙ্গীদের দেখা।।
আর হবে না তোদের সঙ্গে
হাসি ঠাট্টার সুরে কথা কওয়া।।

"শেষ গন্তব্যে"

অরিন্দম পাল

চলে যাওয়া মানে শেষ নয়- বিচ্ছেদ নয়
চলে যাওয়া মানে নয় বন্ধন ছিন্ন-করা,
চলে যাওয়া মানে নয় ব্যস্ততার সাথে ভুলে যাওয়া
চলে গেলে হয়তো অধিকাংশ কিছু মুহূর্ত থেকে যাবে
আমার না-থাকা জুড়ে।
জানি চরম সত্যের কাছে নত হতে হয় সবাইকে-
আমাদের জীবনতো ব্যস্ততার জীবন, অতি সাধারণ, অতি স্বল্প
তবুও সবচেয়ে সুন্দর এই যে বেঁচে আছি বেঁচে থাকা
তবুও কি আজীবন বেঁচে থাকা যায়!
আজ বিদায় হয়েছি বহুদিন
বছর তো ঘুরে চলেছে
তবুও তো ভুলে যেতে পারিনি, সেই ফেলে আসা দিন, ফেলে আসা স্মৃতি,
এতো আনন্দ, মনে তো পরে বহুবার!
তবুও তো বেঁচে আছি বাংলা মধ্যে বাংলা কে ঘিরে !
জানি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যেতে হয়
সবাইকে এক অজানা গন্তব্যের মধ্যে।
তবুও আমাদের বাংলা বিভাগ বাংলা ভাষা বেঁচে থাকুক
প্রতিটা সম্পর্কে প্রতিটা মুহূর্তে সবার সাথে সবার মাঝে।।

ধন্যবাদ

আহ্বান

সুস্মিতা দাস

ছন্দ মিলেছে নতুন গন্ধতে
তোমায় দেখায় অন্তহীন সব,
বিলীন হয়ে চলেছে পুরানো কথা...
মিলিয়ে যাচ্ছে একে একে সকল স্মৃতি...
আরও একবার নতুন পথ চলা হয়েছে শুরু।

তখনই এসেছে তোমার আহ্বান...
প্রখর উত্তাপেও যেন রয়েছে শান্তি।
পুরানো স্মৃতিচারণায় দীর্ঘায়িত মন...
যেন তৃপ্তির শিতল হাওয়া বয়েছে আজ,
তোমার ডাকে দিতে চায় সারা...

জানি বাধাপ্রাপ্ত হবো হয় তো,
অনেক কিছু দিয়েছো...
এবার শুধু সবার সাথে আবার দেখা হবার পালা...

অভিমান

প্রথমা ঘোষ
প্রাক্তন ছাত্রী (বাংলা বিভাগ)

অর্থের লোভে একদিন যারা দেশান্তরী হয়েছিলে
আজকে তাদের ফিরতে হচ্ছে সেই দেশেরই কোলে।
মাতৃভূমিকে সেদিন আঁধার করেছিলে আপন স্বার্থসিদ্ধিতে
সকল মায়ার বাঁধন ছিন্ন করেছিলে এক মুহূর্তে।
পারতে হয়তো ভারতমাতাকে আরো সমৃদ্ধশালী করতে
বিশ্ব মাঝে শ্রেষ্ঠ আসনে তাকে আবার তুলে ধরতে।
কিন্তু সেদিন ভাবোনি তোমরা তোমাদের দেশমাতার মান
শুধু নিজেদের স্বার্থকেই দিয়েছিলে সম্মান।
আজ যখন হঠাৎ এক অজানা বিপদের সম্মুখীন হলে
স্বার্থপরের মতো দেশবাসীর কথা না ভেবে ফিরতে যে চাইলে।
তবু মুখ ফিরিয়ে নেয়নি সে, করেনিকো কোনো অভিমান,
সমূহ বিপদ আসছে জেনেও তোমাদের জানিয়েছে সম্মান।
কোথাও গেলে খুঁজে পাবে না গো এমন উদারতা,
তাই তো সে সকলের শ্রদ্ধেয় আমাদের ভারতমাতা।

পণপ্রথা

পূজা ধীবর

পণপ্রথা কী দারুণ ব্যাথা,
বোঝে শুধু কন্যার পিতা।
মেয়ের বিয়ে দিতে হলে,
সু-পাত্র চাই।
পাত্র তো জুটলো কিন্তু
টাকা কোথায় পাই?
টাকা না দিলে মেয়ে আমার,
সইবে গঞ্জনা।
শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে পাবে,
শত যে লাঞ্ছনা।
পুরুষ বোঝো তারা নারী ছাড়া অসম্পূর্ণ,
তবুও নারী কেন টাকা দ্বারা গণ্য?
নারীদের জীবন হবে সুফল,
যেদিন ঘুচবে পণপ্রথার কুফল।

দুর্গা

তিথি চাটার্জ্জী

দুর্গা মা এলে বিশাল আয়োজন
ঘরে আসে আত্মীয়-পরিজন
কিন্তু গর্ভে দুর্গা এলে মালিন মুখ
নেমে আসে যেন বিশ্বের দুঃখ
তবুও আমরা খুঁজে পাই দুর্গা পূজায় সুখ
হাজারো দুর্গা পথে বসে পাই না কিছু ভালোবাসা
মাটির দুর্গার খাবারের আয়োজন ভোর থেকে উঠে
আজ দুর্গা বাইরে গেলে ধর্ষনের ভয়
তবুও আমরা সজোরে বলি "বলো দুর্গার মা এর জয়"
দুর্গা মায়ের হাতে ত্রিশূল হাতে পূজো করি
ঘরের দুর্গার প্রতিবাদের ভাষা, তখন মূর্খরা ভারি
দুর্গা মায়ের খড়ের শরীর জল থেকে তুলে আনে
ঘরের দুর্গার সুন্দর শরীর অ্যাসিড দিয়ে মারি।
দুর্গার মায়ের আসার অপেক্ষায় থাকি অনেক দিন
জন্মদাত্রী দুর্গা বৃদ্ধাশ্রমে, নেই তো কোনো ঋণ।

পুলক

মানসী কুন্ডু

নবচেতনায় নববর্ষ
হৃদয়ে থাকো হর্ষ।
বৈশাখ এলো রে, সবার মনে,
পুরাতন স্মৃতির গোচরে।
এসো রে। মহা বিদ্যালয়ের...প্রাঙ্গণে,
মেতে উঠস, প্রাক্তন প্রক্তনীরা আনন্দ
উল্লাসে। খুশির জোয়ার সবার মনে,
ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে।
শিক্ষকরা ও আনন্দে,
ভেতর বাহির অন্তরে।
বাংলা আমার মাতৃভূমি,
আমরা তার রাজা রানী।
বছর শুরু পুষ্প পাতা,
এলো রে, পুনর্মিলন মিলন বার্তা।।

Mankar College